প্রহেলিকা

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

ডি. এম. লাইব্রেরী
কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৩৪৮

এক টাকা বারো আনা

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

১

স্থির হয়ে গেল, চাকরিটা কিছু নয়। আর কিছু ঠিক হ'ল না।

কথা হচ্ছিল চার বন্ধুতে, একটা মেসের নাতিপ্রসর ঘরে ব'সে। দুখানা তক্তপোশ, দুজোড়া তথাকথিত টেবিল চেয়ার, দেওয়ালে টাঙানো দুটো ব্র্যাকেট, মেঝের উপর চা-এর সরঞ্জাম, তক্তপোশের তলায় ময়লা ধুতি জামা, সাত জোড়া জুতো এবং অপরিমিত জঞ্জাল ছিল সে ঘরের আসবাব।

একখানা তক্তপোশের উপর চরম আলস্যের সঙ্গে হাত পা ছড়িয়ে শুয়েছিল বাঁড়ুজ্যে। তার পিতৃদত্ত নাম হর্যক্ষ-বিক্ষোভ। তার চর্বিবহুল পুরুষ্টু চেহারায় হর্যক্ষের বিক্ষোভ না হয়ে লোভ হওয়ারই ষোল আনা সম্ভাবনা এই ইঙ্গিত ক'রে কেউ কেউ তাকে হর্যক্ষলোভন নাম দেবার চেষ্টা করেছিল। আবার কেউ বা তার চর্বিচাপা চোখের দিকে ইঙ্গিত ক'রে তাকে দু-এক দিন কুৎকুতাক্ষ ব'লে ডাকবার প্রয়াস করেছিল। এসব চেষ্টায় মাঝে মাঝে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হয় ব'লেও কতকটা, আর ওই দুষ্পাচ্য নামটা উচ্চারণ করার অসুবিধাতেও কতকটা, সর্বসম্মতিক্রমে তার বন্ধুরা ওটা বর্জন ক'রে তার বংশগত নামেই তাকে সম্ভাষণ করত। শুয়ে থাকবার দিকেই বাঁড়ুজ্যের বেশী পক্ষপাত; বসতে, দাঁড়াতে, চাই কি হাঁটতেও তাকে মাঝে মাঝে দেখা যায়। কিন্তু দৌড়তে তাকে কেউ কোনও দিন দেখে নি।

শ্রীবিলাস অপর তক্তপোশের উপর খাড়া হয়ে বসেছিল। ছিপছিপে গৌরবর্ণ ছোকরা। সে বসে কম, বেশীর ভাগ ছুটেই

বেড়ায়। সব বিষয়েই তার একটা সুস্পষ্ট মত আছে, এবং সে মত প্রতিবাদের অপেক্ষা রাখে না। যদিও তার সাময়িক মতগুলো কখনই দীর্ঘস্থায়ী হয় না এবং প্রায়ই হঠাৎ উলটে যায়, তবু যখন যে মতটা থাকে তার সপক্ষে সে তর্কে সর্বদা প্রস্তুত এবং প্রয়োজন স্থলে তর্কের "সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো" ব্যবহার করতেও সে কুণ্ঠিত হয় না।

তৃতীয় বন্ধুটি নিখিলেশ, এ ঘরের আংশিক মালিক। সুপুরুষ সে, কিন্তু নিরতিশয় অপরিচ্ছন্ন। তার ঘরও যেমন, দেহখানিও তেমনি—অত্যন্ত অগোছালো। 'ঘরে বাইরে' প'ড়ে তার বাপ তার নাম দিয়েছিলেন নিখিলেশ, কিন্তু তার চরিত্র ও চেহারার ঝোঁক সন্দীপের দিকেই বেশী। তার যখন যে ঝোঁক হবে সেটা করাই চাই তার, আর তক্ষণই। আর ঝোঁক, কি কথায় কি কাজে, তার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের সহচর। শ্রীবিলাসের মত তারও মতামত গভীর বিচার বা গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তার মত বজ্রকঠোর, কখনও বদলায় না তার চেহারা। কাজে ও মতে তার খুব বেশী সামঞ্জস্য নেই, তাই জীবনের বেশীর ভাগটা কাটে তার কথা ও কাজের এই বিরোধ মীমাংসা করবার যুক্তির অন্বেষণে।

প্রমোদ একটা চেয়ারে ব'সে, পা দুটো টেবিলের উপর তুলে দিয়ে একখানা খাতার উপর পেনসিল দিয়ে অযথা আঁচড় কাটছিল। প্রমোদের হাতে কাগজ পেনসিল বা কলম নেই এমন মুহূর্ত্ত কল্পনা করা যায় না, কেননা সে হবু-সাহিত্যিক, বেজায় লেখে, আর যখন লেখে না তখন সে কাগজের উপর স্বধু আঁচড় কাটে। প্রমোদ কবি, কল্পনাবিলাসী, অথচ গুণ্ডার মত শক্তিমান; অ্যাডভেঞ্চারের কল্পনায় সে ভরপুর, আর তার সন্ধানে যে কোনও পাগলামি সে মাঝে মাঝে ক'রে থাকে। খুব নিদারুণ কোনও হুজুক বা বিপরীত রকম সাহসের

কাজ সামনে পেলে প্রমোদ উৎসাহিত হয়ে ওঠে। সাইকেলে ঢাকা যাবার সঙ্কল্প ক'রে সে অনেকদূর গিয়েছিল। একবার সার্কাসের দলে মিশে বাঘের খাঁচায় ঢোকবার চেষ্টা করেছিল। আর এখন হাতে কোনও কাজ নেই ব'লে সে দমদমায় গিয়ে এয়ারোপ্লেন ওড়ানো শিখছে।

এরা সবাই এম-এ পরীক্ষা দিয়ে এখন ধীরে সুস্থে বিচার করছে, ততঃ কিম্?

যখন সবাই বললে চাকরি কিছু নয়, তখন বাঁড়ুজ্যে একটা হাই তুলে বললে, "যা বললে, ও টক ফল খাবার অযোগ্য! মুসলমান, নমশূদ্র প্রভৃতি নিতান্ত মূর্খ যারা তারাই ওতে রস পায়।"

শ্রীবিলাস বললে, "কী? টক ফল! এতে সুধু এই প্রমাণ হচ্ছে যে, দাসত্বটা তোমার কতদূর মজ্জাগত। জান তো আমাদের ঋষিরা ব'লে গেছেন, 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্ধং কৃষিকর্মণি, তদর্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ'।"

পরম নির্লিপ্তভাবে বাঁড়ুয্যে বললে, "কোনও ঋষি ও কথা বলেন নি, এবং কথাটা আগাগোড়া ভুল।"

"ভুল! কিসে ভুল?" নিখিলেশ গর্জ্জন ক'রে উঠল। বাঁড়ুয্যে বললে, "প্রথমত ব্যাকরণের ভুল, বস্ ধাতু পরস্মৈপদী, 'বসতে' হয় না।"

"ওঃ! ব্যাকরণের কচ্‌কচি" ব'লে শ্রীবিলাস হো হো ক'রে হেসে উঠল।

তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে বাঁড়ুজ্যে বললে, "দ্বিতীয়ত লক্ষ্মী পেঁচার পিঠে বাস করতে পারেন, পদ্মে থাকতে পারেন, চাই কি সাগরেও ডুব মেরে থাকতে পারেন, কিন্তু বাণিজ্যে—কখনও নয়, আর কৃষিকর্মে একেবারেই নৈব চ।"

"একথা কোন্ ঋষি বলছেন ?" প্রমোদ জিজ্ঞাসা করল।

"আপাতত আমি, শ্রীহর্যক্ষ—"

"থাম, সর্বসম্মতিক্রমে ও নাম বাতিল, ওটা আর মুখে এনো না। কিন্তু এত বড় স্পর্ধা তোমার, যে, এতদিনকার পণ্ডিতদের মত খণ্ডন করতে সাহস কর—কে তুমি ?" নিখিলেশ বললে।

"আমি ? আমি ঘরপোড়া গরু।"

"তুমি মুখপোড়া বাঁদর" ; শ্রীবিলাস বললে।

বেশ গম্ভীরভাবে অনেকটা বিবেচনা ক'রে বাঁড়ুজ্যে বললে, "তাও বলতে পার, কেননা, মুখ পোড়া যাবার পর হনুমান আর কোনও দিন ল্যাজে আগুন বাঁধতে উৎসাহ দেখিয়েছেন ব'লে ইতিহাসে বলে না।"

"কিন্তু তোমার ল্যাজে আগুন এখনও জ্বলছে"—শ্রীবিলাস আরম্ভ করলে। তাকে বাধা দিয়ে প্রমোদ হঠাৎ উঠে বললে, "থাম, এ কথাটায় একটা উপন্যাসের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তোমার বক্তব্য বোধ হয় এই যে, তুমি ব্যবসা ক'রে ঠেকে শিখেছ। সেই অপূর্ব্ব কাহিনীটি ব'লে ফেল দিকিনি।"

শ্রীবিলাস বললে, "আমি কিন্তু আগে থেকেই ব'লে রাখছি যে, সে কথা আমি বিশ্বাস করব না।"

নিখিলেশ বললে, "আমিও না।"

প্রমোদ সায় দিয়ে বললে, "অবশ্যই নয়। বাঁড়ুজ্যের এরকম উপাখ্যান চিরদিনই অসত্য, কিন্তু ঠিক সেই পরিমাণে রসাল হয়। আমি রসের পূজারী, সত্যের পিপাসা আমার নেই। ব'লে যাও।"

বাঁড়ুজ্যে বললে, "বিশ্বাস না করবার কোনও হেতু নেই, কেননা

তার পাথুরে প্রমাণ আমি দিতে পারি। ম্যাট্রিক পাশ ক'রে আমি আগরায় গিয়েছিলাম জান?"

প্রমোদ বললে, "হাঁ, সে কথা বার বার বলতে বলতে তুমি হয়তো নিজেই তা সত্য ব'লে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছ। আমরা সেটা অবিশ্বাস করি। আর এই উপলক্ষে আবার যদি তাজমহলের বর্ণনা শোনাতে চাও তো থেমে যাও।"

"তাজমহলেরই কথা বলব, কিন্তু শাজাহানের তৈরী তাজমহল নয়। আগরার পথের ধারে এখনও বহু শিল্পী রোজ ব'সে ছোট বড় অনেকগুলো তাজমহল তৈরী ক'রে থাকে, সে খবর বোধ হয় তোমরা শুনে থাকবে।"

নিখিলেশ বললে, "বাজে কথা ফের বলবে তো চড় খাবে। তোমার বাণিজ্যবার্তা বলতে চাও, বলতে পার, কিন্তু ও আগরার ফক্কুড়ি চলবে না।"

বাধা অগ্রাহ্য ক'রে বাঁড়ুজ্যে ব'লে গেল, "আমি তখন তোমাদেরই মত বিশ্বাস করতাম, বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস। তাই সঙ্গে যা কিছু ছিল ঝেড়ে ঝুড়ে এক শ টাকার এই তাজমহল কিনে আনলাম— তা থেকে বিস্তর লাভ করব ব'লে। পথে অর্ধেক গেল ভেঙে; যা রইল তার অর্ধেক সবাই লুটে নিলে। বাকী সিকি বেচলাম ধারে, তার এক পয়সাও আদায় হ'ল না।"

প্রমোদ বললে, "এতে শ্রীবিলাসের কথাই প্রমাণিত হ'ল।"

সবাই একটু বিস্মিত হয়ে প্রমোদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলে।

প্রমোদ বললে, "বাণিজ্য কথাটার মানে জান?"

বাঁড়ুজ্যে বললে, "অভিধানে বলে—"

বাধা দিয়ে প্রমোদ বললে, "অভিধান যা বলে না, সেইটাই এর আসল মানে। বাণিজ্যটা এক্ষেত্রে করেছিল তারাই যারা সোজা লুটে নিয়ে

গেল কিংবা দাম দেবে ব'লে নিয়ে দিলে না। এইটেই আসল বাণিজ্য, অর্থাৎ পরের ধন ছলে বলে লুটে নেওয়া। তাতেই লক্ষ্মী—Quod erat demonstrandum."

বাঁড়ুজ্যে হেসে বললে, "হার মানলাম, I stand corrected."

বলা বাহুল্য প্রমোদের এ রসিকতা নিখিলেশ বা শ্রীবিলাসের পছন্দ হ'ল না। নিখিলেশ বেশ তীব্রস্বরে বললে, "গুরুতর বিষয় নিয়ে ছ্যাবলামো করাটা অতি খেলো রসিকতা। আমাদের সামনে যে সমস্যা সেটা জীবন-মরণের কথা, বিচারের কথা—ছ্যাবলামির নয়।"

শ্রীবিলাস বললে, "যাকে বাণিজ্য ব'লে দম্ভ করছ বাঁড়ুজ্যে, তার খাঁটী নাম হচ্ছে বেকুবি। তুমি যদি আস্ত গাধা না হ'তে তবে ওই তাজমহল বেচে একটা প্রকাণ্ড সমৃদ্ধির পত্তন করতে পারতে। সামান্য ফিরিওয়ালা হয়ে আরম্ভ ক'রেও লোকে এমনি ক'রে ক্রোড়পতি হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত একটা দুটো নয়, হাজার হাজার বর্তমান।"

"হাজার হাজার না হ'ক, দু-দশটা আছে," বাঁড়ুজ্যে স্বীকার করল, "কিন্তু যে সব প্রক্রিয়ায় তারা ক্রোড়পতি হয়েছে তার নমুনা দেখতে চাও তো সেটা সত্যি মাল বেচা কেনার কারবারে দেখতে পাবে না, দেখ গে ফাটকার বাজারে, শেয়ারের বাজারে। বড় বড় গালভরা নাম দিয়ে সেখানে যে উপায়ে লক্ষ্মীকে বাঁধা হয় সাদা বাঙলায় তার নাম বাণিজ্য অর্থাৎ পরের ধন গ্যাঁড়া দেওয়া, জুয়া খেলা—"

নিখিলেশ অর্থবিদ্যায় এম-এতে ফার্স্ট ক্লাস হবার আশা রাখে। সে উষ্মার সঙ্গে বললে, "খুব ইকনমিক্স পড়েছ বাঁড়ুজ্যে! Futures market আর জুয়া খেলা এক হয়ে গেল। জান, এই Futures market আধুনিক ব্যবসার একটা অপরিহার্য অঙ্গ, এ ছাড়া বিশ্বজোড়া ব্যবসা চলতে পারে না। ওর মূল সূত্র হ'ল—"

প্রমোদ বাধা দিয়ে বললে, "ইকনমিক্সের লেকচার শোনাতে চাও, ছাত্র খুঁজে বের কর গে। বাবা, ছ ছ বচ্ছর প্রফেসারের লেকচার শুনে ঘুমিয়েছি, আজ জেগে জেগে তোমার লেকচার শুনব, মনেও স্থান দিও না।"

নিখিলেশ বললে, "কিন্তু জিনিষটা বোঝা দরকার—"

শ্রীবিলাস বললে, "কোনও দরকার নেই, কেননা বাঁড়ুজ্যে যা বললে তা তার সব কথার মতই ছাঁকা মিথ্যে। যে সব লোক ব্যবসায় বড়লোক হয়েছে তারা সবাই ফাটকার বাজারে বড়লোক হয় নি।"

"ফাটকার কথাটা স্থধু একটা দৃষ্টান্ত, ওর জাতভাই অনেক রকমের আছে, কিন্তু সবারই গোড়ার কথা গ্যাঁড়া দেওয়া।" বাঁড়ুজ্যে বললে।

নিখিলেশ চেঁচিয়ে উঠল, "Shut up! তুমি কিচ্ছু জান না।"

বাঁড়ুজ্যে নির্লিপ্তভাবে বললে, "ঠিক বলেছ, কিন্তু আমি সক্রেটিসের মত এইটুকু জানি যে আমি জানি না। তুমি তাও জান না।"

নিখিলেশ উগ্র হয়ে উঠল। এর পর তর্কটা হ'ল একটা দ্বন্দ্ব যুদ্ধ।

কিছুক্ষণ দ্বৈরথ সমর চলবার পর যখন নিখিলেশ খুব জোর ক'রে বললে যে, ব্যবসা ছাড়া 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়', তখন সংস্কৃতের এম-এ শ্রীবিলাস হঠাৎ মোড় ঘুরে গেল। "দেখ ঋষিবাক্য নিয়ে অমন ভেঙিও না। ব্যবসা ব্যবসা ক'রে খেপে উঠেছ; ব্যবসায় হবে কি? মানলাম হবে টাকা। কিন্তু টাকাই কি সব? অর্থই কি অনর্থ নয়? আসল আমরা চাই কি? পরমার্থ। অর্থ তোমাকে পরমার্থের পথে নেবে না। এতগুলো লেখাপড়া শিখে শেষে আমরাও কি বাজে লোকের মত স্থধু অর্থ নিয়েই মেতে থাকব, পরমার্থের কথা একদম ভুলে?"

বাঁড়ুজ্যে যেন এ কথায় হকচকিয়ে গেল। একটু সামলে সে বললে,

"লাখ কথার এক কথা বলেছ ভাই। অতএব আমাদের একমাত্র কর্তব্য এই, অর্থের সাধনায় পদাঘাত ক'রে কৌপীন প'রে বেরিয়ে পড়া। অর্থটা পাবার কোনও পথই যেখানে নেই, সেখানে তাকে অবহেলা করাই একমাত্র পথ।"

শ্রীবিলাস নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে বললে, "তোমার কাছে এটা তামাশার কথা হ'তে পারে। কিন্তু, ওরে অন্ধ, দেখছ না কি এই অর্থের সাধনায় পৃথিবী কোন্ সর্বনাশের দিকে ঝুঁকে চলেছে? আজকে যে সমরানল জ্বলে উঠেছে ইউরোপে, এ কি স্বধু তারই জন্যে নয়?"

প্রমোদ বললে, "আর এই বাংলা দেশেই দেখ না, মুসলমান আর তফসিলীরা সব চাকরিগুলো কেড়ে নেবার জন্য কোমর বেঁধেছে, চাষীরা খাজনা দিতে চায় না, মজুরেরা কোনও কাজ না ক'রে মাইনেটা আঠার আনা ক'রে নিতে চায়, এ সবই তো সেই অনর্থক অর্থের টানে। এই দুর্ভাবনা ঘুচে গেলে কি স্বখেই আমরা থাকতে পারতাম, ভেবে দেখ।"

বাঁড়ুজ্যে বললে, "অর্থাৎ এই দুনিয়ায় যদি আর সবাই স্বধু ত্যাগ ধর্মের সাধনা করত, আর আমরা কটি প্রাণী তাদের ত্যাগ করবার স্বযোগ দেবার জন্য স্বধু তাদের সেবা ও দান গ্রহণ করতে থাকতাম! ঠিক বলেছ ভায়া, এমন হ'লে ত্যাগ ধর্মের মত জিনিসই নেই।"

শ্রীবিলাস ক্রমেই চটে যাচ্ছিল। তীব্র জ্বালাময়ী ভাষায় সে ত্যাগের ও সেবার প্রশস্তি গেয়ে গেল; বললে যে, লেখাপড়া শিখে নিঃশেষে লক্ষ্মীর সাধনার চিন্তা করে তারাই, যারা নিঃশেষে লক্ষ্মীছাড়া। এবং পরিশেষে তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করলে যে, অর্থের চিন্তা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ ক'রে সে পরমার্থের সাধনা আর দেশের সেবা করবে।

নিখিলেশ ঠিক তেমনি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করলে যে চাকরি বা

ওকালতি সে করবে না, করবে ব্যবসা। চাই কি একটা মনিহারী দোকানও করতে পারে।

প্রমোদ বললে যে, কলালক্ষ্মীই তার একমাত্র আরাধ্য।

বাঁড়ুজ্যে বললে, "কিন্তু তাঁর সেবায় যদি কাঁচকলা বই কিছু না জোটে?"

প্রমোদ তাই তার কথায় একটা উপাধি যোগ ক'রে বললে, "যতক্ষণ তিনি কাঁচকলা না খাওয়াচ্ছেন।"

বাঁড়ুজ্যে বললে, "যখন কোনও কিছু স্থির করা গেল না তখন আপাতত নিদ্রাই আমার সাধনা। বাইশ বছর বয়স হ'ল, কি হুড়োয় এতদিন কাটল। সে হুড়ো যখন মিটেছে, তখন আপাতত যতদিন পারি, শুয়ে বাঁচব।"

এর পর বন্ধুরা মফস্বলে যে যার দেশে ছিটকে পড়ল।

২

দু বছর পর আবার তাদের দেখা।

প্রথমে প্রমোদ হঠাৎ কলকাতার রাস্তায় দেখতে পেলে নিখিলেশকে। প্রমোদ বললে, "এই যে! কি ভায়া, তোমার মনিহারী দোকান খুলেছ কোথায়?"

দু বছর আগের সে তর্কের কথাটা নিখিলেশ ভুলেই গিয়েছিল। এদের যে বয়েস তাতে এমন হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। এ বয়সে যখন যে প্রশ্নটা সামনে আসে সে সম্বন্ধে যুবকেরা আলোচনা করে, যেন সেটা জীবন-মরণের সমস্যা। মহাযুদ্ধের কারণ বা ভবিষ্যৎ আলোচনাই হ'ক, দেশের প্রগতি বা অধোগতির কথাই হ'ক, আর সেদিনকার বাজারে

বেগুন বা চিংড়ি মাছের ঠিক কি দাম সে প্রশ্নই হ'ক, সবই তারা আলোচনা করে নিদারুণ আগ্রহ সহকারে। সে প্রশ্ন সম্বন্ধে দ্রুত মত গঠন এবং বিরুদ্ধবাদীকে পর্যুদস্ত ক'রে সে মত প্রতিষ্ঠা তাদের স্বাস্থ্য ও জীবনের ভবিষ্যতের জন্য যেন অপরিহার্য। কিন্তু তর্ক মিটে গেলে সে প্রশ্নের প্রায়ই আর প্রয়োজন থাকে না, আর দুদশ দিনে সে কথা এরা ভুলেও যায়।

কথাটা প্রমোদ মনে করিয়ে দিলে নিখিলেশ বললে, "ও, সেই কথা। হাঁ তা—মনিহারী দোকানের কল্পনা ছাড়ি নি একেবারে, কিন্তু ভাবছি, এদিকে পরিষ্কার হয়ে তার পর ওসব ভাবা যাবে।"

নিখিলেশের ময়লা বেশ আর খোঁচা খোঁচা দাড়ির দিকে চেয়ে প্রমোদ বললে, "হাঁ তা পরিষ্কার হওয়ার দরকার তোমার আছে বই কি; কিন্তু সে তো সহজ কথা, সের খানেক ঢাকাই সাবান দিয়ে ঘণ্টা দুই পরিশ্রম আর একটা ক্ষুর নিয়ে আধ ঘণ্টা টানাটানি করলেই—"

"আরে দূর বেকুব! সে পরিষ্কারের কথা বলছি নে। এদিকে একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে তারপর জীবন সংগ্রামে নামব তাই—"

"এদিকে মানে কোন্ দিকে?"

"ঘরের দিকে। এতদিন দুটো ঝঞ্ঝাট ছিল। ইস্কুল কলেজের হাঙ্গামা চুকিয়ে দেওয়া গেছে। সংসারের কাজগুলো শেষ ক'রে নেব ভাবছি।"

"সংসারের কাজ শেষ করবে? বেঁচে থাকতেই? আকাশকুসুম দেখছ নাকি?"

"না না, মানে একটা কাজ এখন হাতের গোড়ায় আছে সেটা শেষ করব—ওর নাম কি বলে—বিয়েটা।"

প্রমোদ চমকে উঠে বললে, "বিয়েটাকে বলছ শেষ? ও যে ঝঞ্চাটের স্থধু আরম্ভ। জীবনসমুদ্রে সাঁতার কাটতে নামবার আগে, ঠাউরেছ গলায় বিশ মনী পাথর বেঁধে নেবে?"

"হাঁ, তা—তা, মিথ্যে বল নি, কিন্তু ওর আর এক দিকও আছে। যতদিন বিয়ে না হচ্ছে ততদিন দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত বিশ ঘণ্টা ও নিয়ে নানা দুশ্চিন্তা হবেই। মেয়ের বাপমা-রা ঝুলোঝুলি করবেন, মা-বোনেরা চব্বিশ ঘণ্টা এই নিয়েই মাথা ঘামাবেন, আর আমারও আজ এটা কাল সেটা দশ রকম খেয়াল গজাতে থাকবে। তার চেয়ে একবার নাক মুখ বুজে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ওটা সেরে ফেললে জন্মের মত নিশ্চিন্ত।"

"নিশ্চিন্ত! না চিন্তার কাঁটা গাছকে সার দিয়ে বোনা—রোজ যাতে নতুন নতুন বিষমাখা কাঁটা বেরিয়ে হাত পা ছড়িয়ে হঁ ক'রে তোমায় গিলতে থাকবে। প্রথম, একটার জায়গায় দুটো পেট চালাতে হবে। তারপর দেখতে দেখতে তিনটে, চারটে—arithmetical progressionএ বেড়ে যাবে। মেয়ের বিয়ে, ডাক্তারের খরচা সে সব কথা নাই তুললাম। এর নাম নিশ্চিন্ত হওয়া! পাগল হয়েছ তুমি!"

একটু চুপ ক'রে থেকে নিখিলেশ বললে, "পাগলও বোধ হয় একটু হয়েছি।"

"তাই বল। প্রেমে পড়েছ, মরেছ। তা বেশ। হাঁ সে ভাগাড়টি কোথায় জুটিয়েছ?"

স্পষ্ট অসন্তোষের সঙ্গে নিখিলেশ বললে, "ভাগাড়! হুঃ! দেখতে যদি তাকে একবার তো অমন একটা কদর্য উপমা দিতে তোমার জিভ জড়িয়ে যেত।"
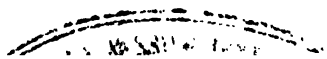
"খুড়ি ভাই খুড়ি! বেশ কড়া রোমান্সের গন্ধ পাচ্ছি। যদি বাধা না থাকে একটু বিস্তারিত খবর জানতে বাসনা। মেয়েটি কার?"

"জানি না, মানে ঠিক এখনও জানি না।"

"Splendid! আর মেয়েটি? তাকেও বোধ হয় চেন না, হয়তো স্বপ্নে বা চিত্রে দেখেছ, কেমন?"

ভ্রূকুটি ক'রে নিখিলেশ বললে, "না হে না, অত কল্পনাবিলাসী আমি নই। মেয়েটিকে দেখেছি; স্বধু দেখেছি নয়, তার সাথে কথা কয়েছি, আর—চোখে চোখে অনেক কথাই হয়েছে যা মুখে বলবার দরকার হয় নি।"

"ও বুঝেছি, একদিন হঠাৎ পথে চলতে চলতে দেখতে পেলে তিনি সারা পথ রূপের ঢেউ তুলে পঞ্চাশ মাইল বেগে মোটরে চ'ড়ে চলছেন। তুমি বললে 'বাঃ', তিনি তোমার দিকে চেয়ে, খুব সম্ভব পাশে যিনি বসেছিলেন তাঁকেই চেঁচিয়ে বলছিলেন, 'আ=হা! নেকামি করবার আর জায়গা পাও নি।' কেমন?"

"যাও, ওসব ভাঁড়ামি ভাল লাগে না। প্রাণের কথা নিয়ে ঠাট্টা তামাশায় স্বধু রাগই হয়।"

"আবার খুড়ি। এইবার আমি একদম চুপ করলাম, তোমার কথা তুমি ব'লে যাও।"

"বলবার বিশেষ কিছু নেই। ওকে দেখেছিলাম প্রথম দিন পার্কে, তারপর একদিন দেখলাম লেকে। সেদিন তার সঙ্গে ছিল ছোট্ট একটা মেয়ে। মেয়েটা বেলুন কেনবার জন্য বায়না নিয়েছিল, ও বলছিল পয়সা নেই। আমি অমনি ছুটে গিয়ে তিনটে বেলুন আর এক বাক্স চকোলেট ছোট মেয়েটাকে দিলাম।"

"তাতে তিনি ঠাস ক'রে তোমার গালে দুটো চড় লাগিয়ে সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ?"

"মোটেই না। তাতে তার মুখ চোখে এমন একটা রঙিন আভা এল যার মত মনোরম কিছু জগতে হ'তে পারে না। তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে এমন একটা তীব্র আনন্দ প্রকাশ ক'রে ফেললে যে, আমার হৃদয় তাথৈ তাথৈ ক'রে নৃত্য ক'রে উঠল। আমি তারপর তার সঙ্গে কথা কইলাম। খানিকটা দূর তার সঙ্গে হেটে বেড়ালাম। তারপর সে মৃদু হাস্যে সমস্ত মুখ আলোকিত ক'রে বললে, 'এখন পালাই'। 'যাচ্ছি, যাই, চললাম,' এসব বাজে কথা নয়,—'পালাই'! সব কথাই তার এমনি কাব্যময়।"

"বুঝলাম। আমার কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু থেমে গেলে কেন ? চল না, বেড়াতে বেড়াতেই শুনব সব।"

নিখিলেশ সেইখানে এসে একটা লাইট পোষ্টের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বললে, "না ভাই, আমি আর যাব না, এখানেই আমি থাকব।"

"এখানে, এই পথের মাঝখানে ? এখানে তোমার কি কাজ ?"

"আছে ভাই, তুমি যাও এখন, পরে দেখা হবে।"

"কিন্তু তুমিই বা থামলে কেন, আর আমিই বা যাব কেন? ব্যাপারখানা খুলেই বল না।"

"না, না,—বলব, পরে বলব, এখন নয়, এখন তুমি যাও," ব'লে নিখিলেশ প্রমোদকে রীতিমত ঠেলতে লাগল।

"উঁহু, পাদমেকং ন গচ্ছামি। তোমার মানসিক অবস্থা সুস্থ মনে হচ্ছে না, তোমাকে একলা ফেলে যাওয়া বন্ধুত্বের—"

"একমাত্র কর্তব্য। যাও, যাও বলছি—দেখছ না আসছে!"

বলতে বলতে নিখিলেশ হঠাৎ স্থির হয়ে সারা চোখ মুখ একটা স্বর্গীয় হাসিতে উদ্ভাসিত ক'রে ঠিক ফোটো তোলবার মত ক'রে দাঁড়িয়ে গেল।

তার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে প্রমোদ দেখতে পেলে একটি মেয়ে অন্যদিক থেকে এগিয়ে আসছে।

ছোটখাটো মেয়েটি, দেখে মনে হয় না চোদ্দর বেশী বয়স। রূপ তার আছে, আর সে রূপ সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন। চলছে সে এমনভাবে যেন যত্ন ক'রে সে রূপের ঢেউ চারদিকে ছড়িয়ে সকল পুরুষকে ধাক্কা মেরে বলছে—দেখ্, ওরে দেখ্!

নিখিলেশকে দেখে সে ফিক ক'রে হেসে ফেললে। তারপর সে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের একটা নৃত্য তুলে ছুটে চলল। প্রমোদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে নিখিলেশ তার পিছু পিছু গিয়ে ঢুকল একটা দোকানে।

প্রমোদ সে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে স্থির হয়ে চেয়ে দেখলে। মেয়েটি দোকানদারের সঙ্গে কত কথা কইলে, বারে বারে হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল। নিখিলেশ ছবির মত এক মুখ হাসি নিয়ে স্থধু হাঁ ক'রে চেয়ে রইল। মেয়েটি কিনলে, টফি, চকোলেট, রিবন, সেফটিপিন আর একটা ক্রীম। নিখিলেশও দোকানে তার অস্তিত্বের সাফাই স্বরূপে তিন গজ রিবন কিনে ফেললে।

মেয়েটির জিনিসপত্র যখন বাঁধা হচ্ছে তখন নিখিলেশ তার রিবনের গোছা তার ভিতর দিলে। মেয়েটি তার দিকে চেয়ে খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

দোকান থেকে বেরিয়ে নিখিলেশ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলে, "আজ লেকে যাবেন না?"

মেয়েটি বললে, "না আজ সিনেমায় যাচ্ছি।" ব'লে, ছুটতে ছুটতে, যে পথে এসেছিল সেই পথেই চ'লে গেল।

পরে জানা গেছে যে প্রায় বিকেলে মেয়েটি এই দোকানে কিছু না কিছু কিনতে আসে। সেই সন্ধান পেয়ে আজ হপ্তা দুই থেকে নিখিলেশ সারা বিকেল রোজ তার প্রতীক্ষায় এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু এ সম্বন্ধে তার যে কৌতূহলই থাকুক, তা মেটাবার জন্য প্রমোদ আজ অপেক্ষা করল না, সে বেগে পথ চলতে লাগল—নিশ্চয়ই তার নিজের কোনও জরুরী প্রয়োজনে। কিন্তু গেল সে, মেয়েটি যে পথ দিয়ে গেল ঠিক সেই পথেই।

এবং দেখা গেল যে যদিও প্রমোদ নিশ্চয়ই নিজ প্রয়োজনেই ঘুরতে লাগলো তারপর, তবু কি জানি কেন, প্রত্যেকটা সিনেমার দ্বার পথে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে সিনেমা-যাত্রীদের সবাইকে বিশেষ উদ্‌গ্রীব হ'য়ে লক্ষ্য ক'রতে লাগলো।

মেয়েটির নাম যখন সবাই জানতেই পারবেন তখন এখানেই ব'লে রাখলে কোনও হানি নেই যে তার নাম প্রহেলিকা।

৩

সারা বিকেল ও সন্ধ্যা প্রমোদ বিনা প্রয়োজনে লক্ষ্যহীনভাবে ভবানীপুর ও বালিগঞ্জের নানা পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল।—থামল সে বার বার শুধু এক-একটা ছবিঘরের সামনে। প্রত্যেক সিনেমার সামনে সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল।

যখন হেঁটে হেঁটে শ্রান্ত হয়ে সে নিজের এবং জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে

সচেতন হল, তখন সে দেখতে পেলে যে সে এসে পড়েছে সাদান অ্যাভিনিউ-এর একটা অপেক্ষাকৃত জনবিরল স্থানে, আর তার সামনে আছে একটা ছোট্ট দোকান, তার নাম 'সরোবর রেষ্টুরাণ্ট'। তার মাঝখানে একখানা ছোট টেবিলে বসে একটা লোক চা খাচ্ছে আর পাশে একটা লোহার উননে আর একজন একটা অমলেট ভাজছে! প্রমোদের মনে হল, এক পেয়ালা চা খেলে মন্দ হয় না।

দোকানে ঢুকে টেবিলে বসে সে চা-এর হুকুম করল। একটু পরেই সে শুনতে পেল—

"প্রমোদ যে! কলকাতায় কবে এলে? কি করছ? কলালক্ষ্মীর কাঁচকলা প্রসাদ সাধনা, না আর কিছু?"

চেয়ে দেখলে একটু আড়ালে ইজিচেয়ারে অর্ধশয়নে বাঁড়ুজ্যে। সে অযথা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললে, "বাঁড়ুজ্যে যে। তুমি এখানে?"

"আর কি করি ভাই! তোমরা সবাই বললে বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, তাই বাণিজ্যই করছি।"

"বেশ বেশ, তা বাণিজ্য চলছে ভাল? লাভ হচ্ছে দোকানে?"

হেসে বাঁড়ুজ্যে বললে, "বাণিজ্য বেশ চলছে, কিন্তু দোকানে লাভ হচ্ছে না।"

"তবে আর বেশ চলছে কি ক'রে?"

"বেশ চলছে বাণিজ্য, দোকান নয়। বুঝতে পারছ না নিশ্চয়ই। কথাটা খুলে বলি। ভাবছ এটা আমার দোকান? তা নয়। দোকান পটলার, আমি তার উপর বাণিজ্য ক'রে স্বধু দু পয়সা রোজগার করছি। এ দোকানের টাকা দিয়েছে আমাদের পটলা; চেন তো তাকে?

"সে একটা চাকরি পেয়েছে, দশটা থেকে সাতটা পর্যন্ত কাজ,

মাইনে পঁচিশ টাকা। কিন্তু প্রসপেক্ট আছে। সে বলে সরকারী চাকরি, এতে একবার ঢুকতে পারলে কোথায় গিয়ে যে এর শেষ তার ঠিকানা নেই। আজ যাকে দেখছে চাপরাসী কি কেরানী, পঁচিশ বছর পরে কেবল প্রমোশন পেয়ে পেয়ে দেখবে তার মাইনে হয়েছে দু হাজার টাকা, কলকাতায় তিনখানা বাড়ি কিনে ব'সে আছে। আপাতত অবিশ্যি তার বরাদ্দ প্রতি দু বছরে পাঁচ টাকা ক'রে বৃদ্ধি, কিন্তু তবু এই প্রসপেক্ট সে ছাড়তে পারলে না। চাকরি পাবার আগে সে এ দোকানটা খুলেছিল। চাকরি পেতে সে আমাকে এখানে বসিয়ে গেল। বেশ ভাল ব্যবস্থা; টাকা তার, লোকসান হয় তার, কাজ করে ওই চক্রবর্তী, আমি স্বধু ব'সে থাকি। মাসে পঁচিশ টাকা পাই, মাইনের টাকা পেলেই পটলা সেটা আমাকে দিয়ে যায়। আর খাওয়া দাওয়া—যা খুশি খেলেই হল। আর যদি কোনও মতে লাভ দাঁড়ায়, তারও ভাগ পাব। আমার এটা খাঁটি বাণিজ্য, অর্থাৎ পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙে খাওয়া—সে বেশ চলছে। দোকান পটলার, সেটা তেমন ভাল চলছে না।"

তার নিজের কথা ব'লে বাঁড়ুজ্যে বললে, "সে থাক গে, তুমি কি করছ?"

"এখন কাঁচকলাই, কিন্তু প্রসপেক্ট আছে। 'বিবিক্তার' সম্পাদক মশায় আমার একখানা উপন্যাস ছাপবেন বলেন ন মাস হল আশ্বাস দিচ্ছেন, অবশ্য বিনা পারিশ্রমিকে। তা ছাড়া ভাবছি, একটা মনিহারী দোকান করব।"

"মনিহারী!—সে তো তোমার নয়, নিখিলেশের—"

"সে এখন মনোহারী চালাচ্ছে, আমিই মনিহারী করব ঠিক করেছি। খাসা ব্যবসা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, টফি, চকোলেট, রিবন

সেফটি পিন, ক্রীম (এ কয়টা নাম প্রমোদ সেই বিকেল থেকে অনবরতই আবৃত্তি করছিল), আর ধর, এই পাউডার, স্নো, তরল আলতা, দাঁতের পেষ্ট, চিঠির কাগজ, কালি কলম, পেন্সিল কত কিছু রাখা যাবে যার খদ্দের হবেই। কত রকম লোক আসবে, জানাজানি হবে রাজ্যের লোকের সঙ্গে।”

এমনি ক’রে নানা ছন্দে এমন প্রবলভাবে প্রমোদ মনিহারী দোকানের পক্ষে ওকালতি করতে লাগল, আর তার ভিতর ক্রমে এতখানি কবিত্ব ছড়িয়ে দিলে যে, বাঁড়ুজ্যে হাঁ ক’রে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। সে যে কোনও কথা কইলে না তাতে প্রমোদের কোনও অসুবিধা হল না, বরং বিনা বাধায় সে তার বক্তব্য ফয়লাও ক’রে প্রকাশ করতে লাগল, আর কথা বলতে বলতে মনিহারী দোকানের আরও নূতন নূতন রস ও মাধুর্য আবিষ্কার ক’রে তা তার কবির ভাষায় প্রকাশ ক’রতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর যখন সে নিতান্তই থেমে গেল, তখন বাড়ুজ্যে একটা লম্বা নিঃশ্বাস টেনে বললে, “ও বাবা! কাগজ পেন্সিল ছুঁচ সুতো বিক্রির ব্যবসাতে যে এত কাব্য আছে কে জানত।”

“সুধু কাগজ পেন্সিল নয়, টফি চকোলেট রিবন সেফটিপিন ক্রীম,—” এ ফর্দটা তার সুধু মুখস্থ হয় নি, একেবারে এতটা ঠোঁটস্থ হয়েছিল যে সামান্য নাড়া পেলেই সবটা একেবারে পার্বত্য নির্ঝরের মত ঝরঝর ক’রে বেরিয়ে আসছিল।

বাঁড়ুজ্যে চোখ আধখানা বুজে বললে, “টফি রিবন ক্রীম—”

“চকোলেট সেফটিপিন” প্রমোদ যোগ ক’রে দিলে।

“হাঁ হাঁ চকোলেট সেফটিপিন—ভুলে যাচ্ছিলাম—এক কথায় রমণীরঞ্জনের কারবার, এতে রস থাকবার কথা বটে।”

'ঠাকুরঘরে কে ?', এ কথা জিজ্ঞাসা করলেই ঠাকুরঘরে যে কলা খাচ্ছে সে শোনে যেন কলা খাওয়ার বিষয়েই প্রশ্ন হচ্ছে, তাই সে নিজের কথায় ধরা পড়ে যায়। প্রমোদের তেমনি মনে হল যে, বাঁড়ুজ্যে এ কথা ব'লে ইঙ্গিত করছে যে এ মনিহারী দোকানের হঠাৎ সঙ্কল্প কোনও নারীর মনোহরণের আয়োজন। সে তাই ব'লে বসল, "কি যে বল ! রমণীরঞ্জনের কথা আসে কিসে ? তুমি যে ভাবছ মেয়েদের আকর্ষণ করবার জন্য এ কারবার সে কথা একেবারে অমূলক।"

বাঁড়ুজ্যে এবার উঠে বসল। স্থির দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে বললে, "এতক্ষণে বুঝলাম, আগে ভাবি নি। জানতে পারি কি, কোন্ সৌভাগ্যবতীর রঞ্জনের জন্য এ আয়োজন ?"

প্রমোদ বললে, "Bosh !" কিন্তু তার মুখ চোখের ভাবটা অযথা বিব্রত হয়ে উঠল।

ক্রমে কথাটা প্রকাশ করতেই হল। প্রহেলিকাকে দেখবার পর প্রমোদ তার পিছু নিয়ে তার বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিল। সে দেখতে পেলে যে, প্রহেলিকা যে দোকান থেকে রোজ ওইসব জিনিস নেয় সেটা তার বাড়ি থেকে কতকটা দূরে। অমনি তার মনে হল যে ঠিক তার বাড়ির কাছ বরাবর যদি ওই টফি চকোলেট ইত্যাদির একটা দোকান খোলা যায়, তবে প্রহেলিকা রোজ অত দূর না গিয়ে সেই নতুন দোকানেই যাবে।

তখনই সে সিদ্ধান্ত স্থির ক'রে নিকটবর্তী একটা বাড়ির মালিকের সঙ্গে তার একটা ঘর ভাড়া করবার জন্য কথাবার্তা কয়ে গেল, আর সিনেমার সন্ধানে পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে হিসাব করতে লাগল আসবাব আর মালে কত টাকা লাগবে। বাঁড়ুজ্যে সব কথা শুনে বললে,

"তা হলে তোমার কাছে কথাটার অন্য মানে দাঁড়াচ্ছে। যে লক্ষ্মী তোমার বাণিজ্যে বাস করবেন বলে ঠাউরেছ তিনি স্বর্ণময়ী, রত্নময়ী বা মৃন্ময়ী নন, একেবারে রক্তমাংসময়ী।"

প্রমোদ বললে, "কথাটা মনে হচ্ছে বটে অসম্ভব, কিন্তু হতেও তো পারে। কি বল?"

সেই লক্ষ্মীর সম্বন্ধে নিখিলেশের যে লোভ আছে, চাই কি সে যে ঠিক ক'রে বসেছে একেই বিয়ে ক'রে পরিষ্কার হয়ে জীবন সংগ্রামে নামবে, সে কথাটা প্রমোদ বাঁড়ুজ্যের কাছে চেপে গেল। কেননা, এবিষয়ে সে মনের তলায় একটু সঙ্কোচ বোধ করছিল। বন্ধুর নৈবেদ্যে এমনি ক'রে ঠোকর দেওয়াটা বন্ধুত্বের আদর্শের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যাচ্ছিল না।

বাঁড়ুজ্যে বললে, "একবার দেখতে ইচ্ছে হয় কেমন সে লক্ষ্মী যাকে দেখেই তুমি কলালক্ষ্মীকে কলা দেখিয়ে বাণিজ্যে মত্ত হয়ে গেলে।"

প্রমোদ বললে, "দেখাব তোমাকে, হপ্তাখানেকের মধ্যে। কালই সব ঠিকঠাক করে পরশু দিন দোকান খুলে বসব, তার পর—" বাকীটা তার পুলকোচ্ছ্বসিত মুখভঙ্গী দিয়েই প্রকাশ করলে, ভাষায় সে সম্ভাবনার বেড় পাওয়া সম্ভব হল না।

বাঁড়ুজ্যে বললে, "আমি ভাবছিলাম কি, অতটা পেঁচাল পথে না গিয়ে ঘটক পাঠিয়ে কি নিজে গিয়ে মেয়ের বাপের কাছে কথা পাড়লে হয় না? তুমি এম-এ পাস করেছ, ঘরেও কিছু আছে, তাঁর অমত হবার কথা নয়।"

প্রমোদ বললে, "কি যে বল! আজকাল কি সে দিন আছে যে বাপ মেয়েকে বিয়ে দেবেন আর মেয়ে সুড়সুড় ক'রে গিয়ে পিঁড়িতে

বসবে। তা ছাড়া, যাবেই বা কেন তারা? তার ভিতর রোমান্স কোথায়? আর রোমান্স অত্যতিআধুনিকাদের জীবনের নিঃশ্বাসের বায়ু। ও কোনও কাজের কথাই নয়।"

"তা হবে। মোটা মানুষ আমি, মোটা বুদ্ধিই আমার আসে। কিন্তু হাঁ মেয়েটীর কি জাত? বাপ কে?"

"ও সব বাজে খবরে কি হবে? সে সম্পূর্ণ স্বাধীন মেয়ে, দক্ষিণ বায়ুর মত স্বচ্ছন্দ তার গতি, তার বাপের খবর নেওয়া আর দখিন হাওয়ার বাপের খবর নেওয়া একই কথা।"

"খাসা কথাটা বললে ভাই। কিন্তু হাওয়াটা দক্ষিণা তো? উত্তুরে বা কাল বৈশাখীর নয়তো।"

"Sacrilege! যদি দেখতে তুমি তবে এমন সব উপমা মনেও আনতে পারতে না।"

৪

প্রমোদের যে কথা সে কাজ। তিন দিনের মধ্যে তার দোকান খোলা হ'ল, সাইনবোর্ড টাঙানো হ'ল "রঞ্জন স্টোর্স"। বাড়ুজ্যের কথা থেকেই এ নামের আভাস তার মনে জেগেছিল। নানা রংএর টফি, চকোলেট, লজেঞ্জ, রিবন প্রভৃতি কাচের আলমারি ও শো-কেসে সাজিয়ে প্রমোদ বসল গিয়ে তার দোকানে—ভোর না হতে হ'তেই।

প্রহেলিকার বাড়ি সেখান থেকে দেখা যায়। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত প্রমোদ তার বারান্দা আর দরজা জানালার দিকে তাকিয়ে ব'সে রইল, কিন্তু হায়, চক্ষু সার্থক হ'ল না।

মাঝে মাঝে এক-একবার তাকে অন্যমনস্ক ক'রে দিলে কয়েকটা

ছোট ছোট ছেলে লজেঞ্চুস কিনতে এসে। ভারী বিরক্ত হয়ে সে এক-একবার উঠে তাদের ফরমাশ তামিল ক'রে বসতে যায়, ছেলেগুলো ছাড়ে না। বলে, এটার দাম কত, ওটার দাম কত? তাদের কৌতূহলের সীমা নেই, কিন্তু হাতের পয়সা নিতান্ত অপ্রচুর।

ভারী বিরক্ত হয়ে প্রমোদ শেষে তাদের ধমকে তাড়ালে, নিতান্ত অব্যবসায়ীর মত। কিন্তু উপায় কি? হতভাগারা জানে না যে তাদের সওদার জন্য তো এ দোকান নয়, তারা যে নিতান্ত অনধিকার প্রবেশ করেছে এখানে।

বিকেলে প্রমোদ যখন দোকান খুলতে এল, তখন সে দেখতে পেলে প্রহেলিকা তার দোকানের সামনে দিয়ে তরঙ্গ তুলে ছুটে চলেছে। দোকান না খুলে প্রমোদ তার পিছু পিছু কিছুদূর গিয়ে দেখলে প্রহেলিকা গেল তার সেই আগের দোকানে। সে দোকানের সামনে নিখিলেশ দাঁড়িয়ে আছে দেখে প্রমোদ তাড়াতাড়ি ফিরে এসে দোকান খুলে বসে চুল ছিঁড়তে লাগল। কি দুর্দৈব, দু মিনিট আগে যদি সে আসত তবে আজই তো—।

পরের দিন সে দুপুরে দোকান বন্ধ করলে না মোটে। বাজার থেকে কিছু খাবার কিনে খেয়ে ব'সে রইল।

সারাদিন গেল, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, প্রহেলিকার আজ দেখাও নেই।

এর পর সাত দিন তার কোনও চিহ্নই দেখা গেল না।

ভেবে চিন্তে প্রমোদ একবার নিখিলেশের মেসে গিয়ে হাজির হ'ল।

নিখিলেশও নেই! সে গেছে পুরী। বোধ হয় হপ্তা তিনেক থাকবে। প্রহেলিকাও অবশ্যই গেছে, নইলে নিখিলেশ নড়ে? হতাশ হয়ে প্রমোদ দোকানে এসে বসল।

একবার মনে হ'ল পুরী গেলে কেমন হয়? কিন্তু ভাবলে কি লাভ? নিখিলেশ পুরী ও প্রহেলিকাকে দখল ক'রে বসে আছে, কোনও স্থবিধে হবে না। তা ছাড়া দোকান যখন ক'রে বসেছে সে, সে দোকান ফেলেই বা যায় কেমন ক'রে?

একদিন দোকানে ব'সে ব'সে এমনি ভাবছে প্রমোদ, হঠাৎ বাঁড়ুজ্যে এসে হাজির।

"এই যে এখানে দোকান খুলে বসেছ। বেশ বেশ, আসল কাজ এগুলো কিছু?"

ও অপ্রিয় প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রমোদের উৎসাহ ছিল না। সে এ প্রশ্ন অগ্রাহ্য ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি তোমার বাণিজ্য ফেলে এলে যে বড়?"

একটা টুলের উপর যথাসম্ভব চেপে ব'সে বাঁড়ুজ্যে গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে বললে, "সে ভাই চুকে গেছে।"

"কি রকম?"

"পটলাটা সেয়ানা হয়ে গেছে। সে স্থির করেছে একা চক্রবর্তীকে দিয়েই দোকান চালাবে, মাইনের টাকাটা এখন থেকে সে ঘরেই নিয়ে যাবে। তাই অগতির গতি প্রাইভেট টিউইশনের চেষ্টায় ঘুরছি। হাঁ ভাই, এইটেই গোকুল মুখুজ্যে লেন না?"

"হাঁ।"

"৬৫নং বাড়িটা কোন্‌খানে বলতে পার কি?"

"৬৫নং বাড়ি?" প্রমোদ যেন চমকে উঠল, "সেখানে তোমার কি দরকার?"

"একটা টিউইশনের বিজ্ঞাপন দিয়েছিল তারা, আজ আমাকে তলব হয়েছে। কোন্‌খানে বাড়িটা?"

অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে প্রমোদ প্রহেলিকাদের বাড়ি দেখিয়ে দিলে। জিজ্ঞাসা করলে, "চাকরি হয়ে গেছে তোমার ?"

"হয়নি, তবে ডেকেছে যখন তখন হ'তেও পারে।"

চট্ ক'রে প্রমোদের মনে হ'ল বাঁড়ুজ্যে এম-এতে থার্ড ক্লাস পেয়েছে, প্রমোদ সেকেণ্ড ক্লাস। এখনও চেষ্টা করলে হয়তো সে চাকরিটা ছিনিয়ে নিতে পারে।

বাঁড়ুজ্যে বললে, "হ'লেও চাকরি যে টিঁকবে, তা বলতে পারি না। ওরা স্থির করেছে যে ইকনমিক্স আর অঙ্কে আমি খুব সরেশ, কেননা ইকনমিক্সে এম-এ পাস করেছি আর অঙ্ক ছিল আমার বি-এতে। কি ক'রে যে পাস করেছি সে খবর তো ওরা রাখে না। যদি আমার বিদ্যের বহর বেরিয়ে পড়ে তবেই গেছি।"

প্রমোদের উদীয়মান উৎসাহ একেবারে চুপ্‌সে গেল। সেকেণ্ড ক্লাস এম-এ সে, কিন্তু এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকলজিতে। অঙ্ক সে ছেড়েছে ম্যাট্রিকের পরই আর ইকনমিক্সের ধারও সে ধারে না। বড়ই হতাশ হয়ে সে ব'সে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবলে যে নিখিলেশটা কি আকাট মূর্খ। দোকানের সামনে পথে সে হত্যা দিয়ে প'ড়ে থাকে আর একেবারে দুর্গ দখল করবার এতবড় সুযোগের খবরই সে রাখে না! সে তো ইকনমিক্সে ফার্স্ট ক্লাস, অঙ্কও জানে!

বাঁড়ুজ্যে ব'লে গেল, "তবে ভরসা এই যে পড়াতে হবে, কোনও ডেঁপো ছেলেকে নয়, একটা মেয়েকে। তাদের আধ ছটাক বুদ্ধিতে আমার বিদ্যের বহর নাও পারে ধ'রতে।"

এইবার প্রমোদ উঠে দাঁড়াল। রাগে সে মনে মনে গজরাতে লাগল, যদিও রাগের কোনও ন্যায্য কারণ ছিল না। কবেই বা থেকে থাকে

তেমন কারণ এসব ক্ষেত্রে? কিন্তু বাঁড়ুজ্যে ওই বাড়িতে গিয়ে একটা মেয়েকে, নিশ্চয় প্রহেলিকাকে, পড়াবে আর সেই মেয়ের বুদ্ধিকে সে মনে করে আধ ছটাক, এতেই সে মনে মনে ফুলতে লাগল।

এই মুহূর্তে ওই বিপুল দেহটাকে গুঁড়ো ক'রে হাওয়ায় মিলিয়ে দেবার কোনও উপায় তার মনে এল না। তদভাবে বাঁড়ুজ্যেকে ভুল পথ ব'লে বিভ্রান্ত করা যেত, কিন্তু সন্ধানটা আগেই দিয়ে ফেলেছে সে। এখন কি করবে বা কি বলবে তা সে কিছুই ঠিক করতে না পেরে মিথ্যেই দাঁড়িয়ে গজরাতে লাগল। এমন সময়—

একটা ছোট মেয়ে হাত ধ'রে প্রবলবেগে হিড়হিড় ক'রে টানতে টানতে প্রমোদের দোকানে নিয়ে এল—প্রহেলিকাকেই।

একটা বিপর্যয় কাণ্ড ঘ'টে গেল। প্রমোদের রাগ একেবারে নিখোঁজ হয়ে উবে গেল। বাঁড়ুজ্যের তিন মণ দেহটার কোনও অনুভূতি তার মনের চতুঃসীমাতেও রইল না। তার সমস্ত মুখ একটা প্রচণ্ড উল্লাস ও কৃতার্থতায় বিগলিত হয়ে গেল, সর্বাঙ্গ থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। সে বসেছিল শো-কেসের পিছনে একটা টুলে, এক লাফে সামনে এসে দাঁড়াল আর তড়বড় ক'রে ব'লে যেতে লাগল, "এই যে আপনি এসেছেন? আসুন (হঠাৎ মনে হ'ল যে এমনি পরিচিতের মত তাকে সম্ভাষণটা ঠিক হ'ল না, তাই সামলাতে গিয়ে বললে), মানে, ওর নাম কি, বসুন—আমি রোজ ভাবি, (থমকে গিয়ে ভাবলে, একথা বলা হবে অমার্জনীয় বেয়াদবি) আপনার জন্যেই এ দোকান (এই রে! এমন কথাও বলে? ছি!) মানে আপনাদের জন্যেই—আপনারা মুখ তুলে চাইবেন, মানে কিনবেন, টফি, চকোলেট, রিবন, সেফটি পিন, ক্রীম—"

ছোট মেয়েটা দোকানে এসে অবধি প্রহেলিকার দিকে চেয়ে ক্রমাগতই ব'লে যাচ্ছিল 'বেলুন, বেলুন।'

প্রহেলিকা ভ্রূকুঞ্চিত ক'রেই এসেছিল দোকানে, ভ্রূকুঞ্চিত ক'রেই বললে, "বেলুন আছে ?"

"বেলুন—বেলুন—তাই তো বড্ড ভুল হয়ে গেছে, বেলুন তো নেই ! সন্ধ্যেবেলায় আপনার বাড়ীতে দিয়ে আসব, কি বলেন ? এখন আর কিছু ? টফি, চকোলেট্, রিবন, সেফটি পিন, ক্রীম—কিছুই চাই না ?"

ততক্ষণ ছোট মেয়েটা প্রহেলিকাকে রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে।

চুপসে যাওয়া বেলুনের মত প্রমোদ মুখখানা কালি ক'রে বসল গিয়ে আবার সেই টুলে।

বাঁড়ুজ্যে এতক্ষণ নিঃশব্দে দৃশ্যটা উপভোগ করছিল, এখন তার মুখখানা বেলুনের মত ফুলে উঠল আর সারা দেহের ভিতর ভূমিকম্প হ'তে লাগল। ক্রমে এই সব উপসর্গ একটা কানফাটান হাসিতে পর্যবসিত হ'ল। সেটা হজম ক'রে শেষে সে বললে, "ইনিই বুঝি তিনি ?"

প্রমোদের মন তখন যে সব সুদূর দেশে ছট্ফট্ ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছিল সেখানে বাঁড়ুজ্যের এ প্রশ্ন পৌঁছুল না।

পুরী যায়নি প্রহেলিকা। মন্দের ভাল। নিখিলেশ হতভাগা সেখানে গিয়ে মরেছে কেন ? কিন্তু কি ভুল ? এত জিনিষ কিনে এনেছে সে, বেলুনের কথাটা খেয়াল হয় নি ! এখনই গিয়ে তিন ডজন—না এক গ্রোস—বেলুন কিনে এনে দোকানের আষ্টেপৃষ্ঠে বেলুন ফুলিয়ে রাখবে। এমন ভুলও মানুষে করে। আর মেয়েটাই বা কি ?

দোকানে এত জিনিস আছে, চকোলেট, লজেঞ্জ, রিবন, সেফ্‌টি পিন, ক্রীম—যা কিনতে প্রহেলিকা নিজে অতদূরে গিয়েছিল সেদিন, তার একটাও তার চাই না, চাই কি না বেলুন। না হয় ছোট মেয়েটা ধরেইছিল বায়না, তাকে এক বাক্স চকোলেট, কি টফি, কি লজেঞ্জ দেখিয়ে ভুলালেও তো হ'ত! এমন বিড়ম্বনা লোকের হয়! যদি বা এতদিনের স্বপ্ন সফল হ'ল, এলো সে দোকানে, তবু হায়, এমন ক'রে এল গেল।

তার কথাগুলা বড় বেফাঁস হয়ে গেছে। হয়তো রাগ করেছে প্রহেলিকা। হয়তো কেন? নিশ্চয়ই। সে দিন সে দেখেছিল প্রহেলিকাকে—যেন তরল হাসির ফোয়ারা। আর আজ, কোথায় সে ফোয়ারা, মুখ চেপে ব'সে আছে তার মেঘ—ভ্রূকুটি। নিখিলেশকে দেখে সে হেসে ওঠে, আর প্রমোদের বেলায় সুধু ভ্রূকুটি! নাঃ! নিখিলেশ ভাগ্যবান, তার সঙ্গে এঁটে ওঠবার কোনও সম্ভাবনাই নেই। আর, দেখ অদৃষ্টের পরিহাস! তার প্রাইভেট টিউটার দরকার, তাও ভাগ্যে জুটবে কিনা ওই হোঁৎকা বাঁড়ুজ্যের!

এতক্ষণে মনটা বাঁড়ুজ্যের কাছে ভিড়ে আসতে সে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল যে বাঁড়ুজ্যে যেন তাকে কি একটা কথা বলছিল। তাই সে বললে, "হাঁ, কি বলছিলে বাঁড়ুজ্যে?"

বাঁড়ুজ্যে হাসছিলই—হাসতে হাসতে সে বললে, "জিজ্ঞেস করছিলাম ইনিই কি তিনি? তা আর বলতে হবে না, বুঝতেই পেরেছি।"

"তবে মাথা কিনেছ," খুব বিরক্ত হয়ে বললে প্রমোদ।

বাঁড়ুজ্যে উঠতে উঠতে বললে, "থাক ভাই, এখন উঠি। দেখি ভাগ্যে কি আছে ?"

প্রমোদ মনে মনে বললে, "ভাগ্যে তোমার ছাই থাকুক, আগুন পড়ুক তোমার মুখে।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ হতাশার সঙ্গে সে অনুভব করলে যে ছাই বা আগুন কোনটাই হয়তো তার ভাগ্যে নেই। ওই হোঁৎকা, ওইটাই কি না কাছে ব'সে অঙ্ক আর ইকনমিক্সের ছাই পাঁশ বোঝাবে—প্রহেলিকাকে! —কি অদ্ভুত খেয়াল মেয়েটার! মেয়েছেলে—সে ইকনমিক্স বা অঙ্ক প'ড়ে কিই-বা করবে—সাইকলজি পড়লেই তো হয়।

৫

হতাশার প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে প্রমোদের মনে হ'ল, সব আশা এখনও যায় নি। কথায় বলে, শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম্। আজ দোকানে এসেছে সে। বেলুন ছিল না সে তার দুর্ভাগ্য, কিন্তু পরের দিন, কি তার পরের দিন আবার নিশ্চয় আসবে এমন কিছু চাইতে যা আছে তার দোকানে।

তাই সেদিন বাজার থেকে রাজ্যের বেলুন কিনে এনে সে দোকানে সাজিয়ে রাখলে।

—সে বেলুন কিনতে অনেকে এলো, এলো না প্রহেলিকা।

তার বাড়ির ছোট মেয়েটি এসেছিল পরের দিন, একটা চাকর সঙ্গে ক'রে।

ইতিমধ্যে এক গাল হাসি নজর নিয়ে বাঁড়ুয্যে ব'লে গেল চাকরী তার হয়েছে, পড়াতে হবে প্রহেলিকাকেই।

ব'সে পড়ল প্রমোদ !

দোকানে সে এখন আসে, বসে—সম্পূর্ণ নিরুৎসাহ হ'য়ে। তার রক্ত শুধু চঞ্চল হ'য়ে ওঠে যখন তার দোকানের সামনে দিয়ে আঁচলের পাখনা উড়িয়ে চ'লে যায় প্রহেলিকা। সে সন্ত্রস্ত হ'য়ে বসে—আশা জেগে ওঠে, বুঝি এই আসে। কিন্তু আসে না, ফিরে চায়ও না।

একদিন, দু দিন, তিন দিন গেল।

প্রহেলিকা রোজ দু তিন বার যায় দোকানের সামনে দিয়ে। কলেজে যায় আসে, লেকে বেড়াতে যায়, হয় তো বা ঐ দূরের মনিহারী দোকানটাতেই যায় ; প্রমোদের দোকানের দিকে ফিরেও চায় না।

রোজ মুখ লাল ক'রে রাজ্যের বেলুন ফুলিয়ে প্রমোদ দোকানের সামনে সাজায়। তাদের রং বেরঙের বাহার দেখে সে ভাবে আজ এগুলো চোখে পড়বেই প্রহেলিকার। রোজ সেগুলো বেচে অন্যের কাছে ; মনে হয় দেবীর পূজার অর্ঘ সে নিবেদন ক'রে দিচ্ছে দৈত্য দানবকে। খদ্দের—বিশেষত বেলুনের খদ্দেরকে সে হিংস্র দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে, যেন তারা চোর—ডাকাত। চুরি ক'রে নিচ্ছে তার বুকের রক্তে গড়া পূজার নৈবেদ্য। রাত্রি হ'লে সে তুলে রাখে বিক্রীতাবশিষ্ট বেলুনগুলো, বাইরের সব সজ্জা নামিয়ে রাখে। হিংস্রভাবে ছুঁড়ে ফেলে দেয় সেগুলো মেঝের উপর ; তারপর দোর বন্ধ ক'রে চাবি দিয়ে হাঁড়িপনা মুখ ক'রে চলে যায় সে তার মেসে।

একদিন সে মরিয়া হ'য়ে দোকান ফেলে রেখেই চল্‌ল প্রহেলিকার পিছু পিছু—একটু তফাতে। ক্রোধে ক্ষোভে তার গা জ্বলে যাচ্ছিল, কেন না সে ভাবছিল মেয়েটা নিশ্চয় যাচ্ছে সেই দূরের টফির দোকানে, নিখিলেশ যেখানে ওৎ পেতে ব'সে থাকে। মনে মনে সে বললে, কিনবেই তো সেই সব জিনিস, প্রমোদের দোকান থেকে কিনতে

কি মাথার দিব্যি দিয়ে কেউ বারণ করেছে তাকে? এই বেয়াড়া হতভাগা মেয়েটার এই খামখেয়ালীর কথা ভেবে তার মস্তক চর্বণ করতে করতে সে তার অনুসরণ করলে।

শেষে দেখতে পেলে সে যে, প্রহেলিকা সে দোকান ছাড়িয়ে চলে গেল, আর—এদিক ওদিক চেয়ে নিখিলেশকেও সেখানে দেখতে পেলে না। দেখতে পেলে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক একজন পক্ককেশ প্রৌঢ়কে যাঁর সঙ্গে প্রহেলিকা চলতে চলতে গিয়ে বাসে উঠে বসলো।

ঘাম দিয়ে তার জ্বর ছাড়লো। যাক, প্রহেলিকা তবে স্বধু জিদ ক'রে তার দোকানকে অবহেলা করেনি, নিখিলেশের সন্ধানে যায়নি। প্রমোদের দোকানে আসেনি স্বধু তার কোনও জিনিসের দরকার নেই ব'লে। দরকার হলেই আসবে সে।

আশা ফিরে এলো। পরম উৎসাহের সঙ্গে সে দোকানটাকে আরও মনোহারী ক'রে সাজাতে লেগে গেল।

দোকানের কাট্তি মন্দ হয় না। সারাদিনই কিছু না কিছু বেচা-কেনা করে সে। হিসেব ক'রে দেখলে যে, এমনি চল্‌লে তার বাসা-খরচ দোকান থেকে অনায়াসেই চলবে। পাড়ার সব বাড়ি থেকেই লোকে এটা ওটা কিনতে আসে। প্রহেলিকার বাড়ি থেকেও আসে, কিন্তু চাকর কিম্বা সরকার—প্রহেলিকা নয়।

তবু অপেক্ষা করতে পারে সে, বিশেষ, দোকান যখন বেশ চলছে। আর তাড়াও খুব বেশী নেই, কেন না প্রহেলিকা বি-এ প'ড়ছে, পাশ হবার আগে বিয়ে হবে না তার নিশ্চয়! অতএব মা ভৈঃ!

বুক ঠুকে সে দোকান সাজিয়ে ব'সে থাকে সারাদিন।

কিন্তু তার ধৈর্য টলে যায় বিকেল কি সন্ধ্যে বেলায়। ক্ষেপে ওঠে

সে, যখন ওই বাঁড়ুজ্যেটা হেলতে তুলতে, পান চিবুতে চিবুতে ঐ পথ দিয়ে যায় প্রহেলিকাকে পড়াতে !

কি কপাল পাষণ্ডটার !

ওকে খুন ক'রে ফেললে ক্ষতি কি ?

কিন্তু তার প্রয়োজন নেই, কপাল তার যত জোর হোক্ বাঁড়ুজ্যে যে প্রহেলিকাকে মুগ্ধ ক'রে ফেলবে এ রকম সম্ভাবনাও তার মনে বিশেষ আমল পেলো না। একে তো ওই মোটা হোঁৎকা চেহারা, তার উপর বেশভূষা সম্বন্ধে তার অপরিসীম অজ্ঞ ঔদাসীন্য যেন ইদানীং আরও বেড়েই গিয়েছিল। ওই জন্তুটাকে প্রহেলিকা কখনই সুনজরে দেখতে পারে না।

প্রহেলিকাকে পড়িয়ে ফেরবার পথে বাঁড়ুজ্যে প্রায়ই প্রমোদের দোকানে ব'সে গল্প সল্প ক'রে যায়। তাতে প্রমোদের রাগ হয়, তবু সে একটু ব্যগ্র প্রতীক্ষা নিয়ে তার কথা শোনে এই আশায় যে, হয়তো সে তার ছাত্রীর প্রসঙ্গেই কথা কইবে।

কিন্তু কি হতভাগা ঐ বাঁড়ুজ্যেটা, সে কথার ধার দিয়েও যায় না সে। তার জীবনের এত বড় অপরিমেয় সৌভাগ্য যেন তার মনে কোনও সাড়াই দেয়নি। যেন সে আসে যায় শুধু দিনগত পাপক্ষয় করতে। প্রহেলিকার অস্তিত্ব তার কাছে যেন বাস, ট্রাম, গ্যাস পোষ্ট বা ইলেক্‌ট্রিক লাইটের মত কলকাতার জীবনের একটা সাধারণ নিত্য আনুষঙ্গিক বস্তু। তাই প্রতীক্ষা করতে করতে প্রমোদ ক্রমে ক্ষেপে ওঠে। শেষে বাঁড়ুজ্যেকে তাড়াবার জন্য সে তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করবার উদ্যোগ লাগিয়ে দেয়।

যদিও বা কালে ভদ্রে প্রহেলিকার কথা বলে সে—সেও এমন কথা যে, তা' শুনে তার গালে, ঠাস ক'রে চড় মেরে দিতে ইচ্ছা করে।

একদিন সে বল্‌লে, "প্রাইভেট টিউশন আর জন্মের পাপের ফল ভায়া। তাও যদি একটা ভাল ছাত্র পাওয়া যায়! কিন্তু আমার বরাতে কি জোটেও যত আকাট!" তারপর তার আর গোটা দু'তিন ছাত্রের মেধার পরিচয় দিয়ে বল্‌লে, "আর এই ছুঁড়ি যাকে পড়াচ্ছি, ছ্যাবলামীর গুরুঠাকুর, কিন্তু আঁক কষতে গিয়ে দুয়ে তিনে কোনও দিন ভুলে পাঁচ নামায় না। আবার বি-এ'তে পড়ছেন অঙ্ক। আর ইকনমিক্স, তাতে তো বিদ্যের জাহাজ।"

রাগে প্রমোদের ইচ্ছে হচ্ছিল তার গলাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলবার। কিন্তু রাগ চেপে সে বল্‌লে, "তাই রক্ষে বল। নইলে দু'দিনেই তোমার বিদ্যের দৌড় বুঝে নিয়ে তোমায় অর্ধচন্দ্র দিত।"

বাঁড়ুজ্যে হেসে বল্‌লে, "তা মিথ্যে বল নি। সে মেয়ে কিছু বুঝুক না বুঝুক, পাশ করুক ফেল করুক, ব'য়ে গেল আমার। আমার মাসে পঁচিশ টাকা তো বেঁচে থাকুক।" ব'লে খুব বেশী হাসলে, এত বেশী যে তাতে ধৈর্য রক্ষা করা প্রমোদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হ'য়ে উঠলো।

হায় রে! বানরের গলায় মুক্তামালা, শুয়োরের সামনে মণিমুক্তা ছড়ান। অন্ধ বিধাতার বিশ্বনিয়মনের কেরামতির এই তো নমুনা! একদিনের জন্যও যদি বিশ্বরাজ্যের ভার পেতো প্রমোদ তবে এর চেয়ে বহুগুণ শ্রেষ্ঠ প্রতিভা দেখাতে পারতো সে!

বাঁড়ুজ্যে ক্রমেই প্রমোদের কাছে বেশী অসহ্য হ'য়ে উঠলো। তাকে দেখলেই সে ক্ষেপে উঠতে চায়! অথচ রোজ তার অশোভন মূর্ত্তি দেখতেই হয় তার, শুনতে হয় তার কথা ধৈর্য ধ'রে।

এত সে সয় শুধু এই আশায় যে, একদিন যদি পায় সে সুযোগ— নাই বা পাবে কেন?—তবে ওই বাঁড়ুজ্যের চোখে আঙুল দিয়ে সে

দেখিয়ে দেবে যে, এ অমূল্য মণির যোগ্য সমাদর কেমন ক'রে করতে হয়।

একটা দুর্দমনীয় আশায় সে কিছু দমকা খরচ ক'রে বসলে ক্যাশমেমো ছাপিয়ে। তার মাথায় লেখা হ'ল—"রঞ্জন ভাণ্ডার। প্রোপ্রায়টার—প্রমোদকুমার ঘোষ, এম-এ"। এ ক্যাশমেমো সব বাড়িতেই যাবে—প্রহেলিকার বাড়িতেও, হয়তো তার চোখেও পড়বে। তখন সে জানতে পারবে যে, প্রমোদ শুধু একটা বাজে দোকানদার নয়—এম-এ। তখন কি প্রহেলিকা তাকে এমনি অবহেলা করতে পারবে?

আরও খরচ ক'রে সে একখানা ছোট সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার ছাপালে, তার ভিতরও তার এম-এ ডিগ্রীটা খুব জলজলে ক'রে দেখান হ'ল। পাড়ার সব বাড়িতে সে ক্যালেণ্ডার বিলিয়ে এলো, প্রহেলিকার বাড়িতে ডজনখানেক দিয়ে এলো।

দিনের পর দিন যেতে লাগলো। দোকানের শ্রীবৃদ্ধি হ'ল, খদ্দের আরও বেশী আসতে লাগলো। কিন্তু প্রমোদের মন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে যেতে লাগলো ক্রমেই। কেন না প্রহেলিকার চাকর যদিও ঘন ঘন আসতে লাগলো এটা ওটা সেটা—লজেন্স, টফি, চকোলেট, রিবন, সেফ্‌টীপিন প্রভৃতি কিনতে তবু প্রহেলিকা এলো না।

রোজই যায় প্রহেলিকা দোকানের সামনে দিয়ে, চটুল চাহনি দিয়ে প্রমোদের দোকানকেও মাঝে মাঝে ধন্য ক'রে যায়, কিন্তু আসে না সে।

মানুষের ধৈর্যের একটা সীমা আছে, প্রমোদের ধৈর্য সেই সীমার উপর এসে টল্‌মল্ করতে লাগলো।

দোকানে লাভ হচ্ছে। কিন্তু সেজন্য কি তার দোকান? যার জন্য

তার এ আয়োজন সে কোথায়?—প্রমোদের মনে হ'ল—এ একটা ব্যর্থ মর্মন্তুদ প্রহসন।

বোঝার উপর শাকের আঁটি! সেদিন প্রমোদ দেখতে পেলে প্রহেলিকা লেক থেকে বেড়িয়ে ফিরছে হাসতে হাসতে, কথা কইতে কইতে—নিখিলেশের সঙ্গে।

সব সীমা পার হ'য়ে গেল।

প্রমোদ বল্‌লে, দুত্তোর!

দোকান বেচে ফেলবে স্থির ক'রে সে খদ্দেরের সন্ধান ক'রতে লাগলো।

জলের দরে দোকান বেচতে সে প্রস্তুত। এখানে ব'সে ব'সে দেখে দেখে জ্বলে পুড়ে মরতে সে আর পারে না।

তার চেয়ে লিখ্‌বে সে।

"বিবিক্তা"য় তার "উড়ো জাহাজ" উপন্যাসখানা এতদিনে বের হ'তে আরম্ভ হয়েছে। দু'চারজন তার প্রশংসাও করছে।

সেই ভাল, শুধু ঘরে ব'সে নভেলই লিখবে। দোকানটা বেচে ফেলতে পারলে বাঁচে।

৬

প্রমোদ লক্ষ্য করে নি, কিন্তু প্রহেলিকা দেখতে পেলো যে, বাঁড়ুজ্যে অর্থাৎ মাস্টার ম'শায়ের চালটা একটু ফিরেছে। প্রথম যখন সে আসে এ বাড়িতে তখন চুল সে কখনও ফেরাত না। এখন ক্রমে চুলের উপর চিরুণী বুরুষের বেশ কারিগরি দেখা যেতে লাগলো। দাড়ি কামানটা আগে বড় হ'ত না তার, আজকাল রোজ সে দাড়ি কামায়। কাপড় চোপড়ের দৈন্য বা এলোমেলো ভাব তার যায় নি, কিন্তু নেহাৎ ময়লা

কাপড়, যা' সে আগে রোজই পরতো, তা আর এখন তার বড় দেখা যায় না। মোট কথা, বাঁড়ুজ্যের অপটু চিত্তের পক্ষে যতদূর সম্ভব হয়েছে, ততখানি বেশবিন্যাস সে এখন করে। এ পরিবর্তনটা এত সুস্পষ্ট নয় যে তা' প্রমোদের চোখে পড়ে, কিন্তু প্রহেলিকার চোখে তা' পড়লো। সে মনে মনে হাসলো।

প্রহেলিকার সম্বন্ধে বাঁড়ুজ্যে যা বলেছিল সেটা চেষ্টাকৃত অতিরঞ্জন হলেও, তার মূলে এইটুকু সত্য ছিল যে, আঁক কষতে প্রহেলিকা প্রায় ভুল করে। কিন্তু তাতে বাঁড়ুজ্যে রাগ করা বা বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, যেন খুশীই হয়। আঁক বোঝাবার সময় প্রহেলিকা তার চক্ষুদুটি বড় ক'রে যেমন ক'রে তার দিকে তাকিয়ে থাকে তাতে বাঁড়ুজ্যে নিজেকে বিশেষ পুরস্কৃত মনে করে, আর তার মনের এ খুশী ভাবটুকু সে যতই গোপন করুক, প্রহেলিকার চোখে ধরা প'ড়ে যায়। আর তাই সে রোজই ইচ্ছে ক'রেও দু'চারটে ভুল ক'রে বসে, শুধু মাস্টার মশায়ের তাকে বোঝাবার জন্য আকুলি-বিকুলি দেখবার জন্য। এমন কৌতুক বোধ করে সে এতে যে, একটা আঁক নিঃশেষে বোঝা হ'য়ে গেলেও সে তার পর এমন একটা বোকার মত প্রশ্ন ক'রে বসে যে বাঁড়ুজ্যেকে আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হয়।

একটা কথা সে কিছুতেই বুঝতে যেন চায় না। নিউটনের Law বলে যে প্রত্যেক ক্রিয়ার একটা সমান উল্টো প্রতিক্রিয়া হয়। প্রহেলিকা বলে, "তা হ'লে ধরুন, ঘোড়া গাড়ীটাকে যখন টানে, তখন গাড়ীটাও ঘোড়াকে ঠিক সমান জোরে উল্টোদিকে টানে। তবে গাড়ীটা এগোয় কেন?"

এ কথাটা বাঁড়ুজ্যে তাকে খুব কম ক'রে একশো বার বুঝিয়েছে, তবু সে-রকম কোনও অঙ্ক এলেই প্রহেলিকা আবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে

সেই প্রশ্নই করে, একটু চেহারা ফিরিয়ে, বাঁড়ুজ্যে কথাটা বোঝাতে গিয়ে যে গলদ্‌ঘর্ম হয় সেইটা সকৌতুকে শুধু দেখবার জন্যে।

ক্রমে প্রহেলিকার যেন সাহস বেড়ে গেল। সে মাস্টার মশায়কে নিয়ে দিব্যি নাচাতে লাগলো। একদিন নিউটনের নিয়ম নিয়ে তিনশ' পঁয়ষট্টিতম আলোচনার মাঝখানে সে জিগ্‌গেস ক'রে বসলে, "হাঁ, মাস্টার মশায়, এই নিয়মটা কি মানুষের বেলায়ও খাটে?"

বাঁড়ুজ্যে বললে, "খাটবে না? আপনি যদি একটা কলসী টেনে তোলেন, তবে আপনি যে শক্তিটা দিয়ে তাকে টানেন কলসীও ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি দিয়ে আপনাকে টানে।"

"কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে একজন আর একজন মানুষকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করছে, তার কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই।"

হেসে বাঁড়ুজ্যে বললে, "ও! এ যে টানের কথা বলেছেন, সে টান Staticsএর নিয়মের বাইরে। মনের টানটা তো আর matter-এর motion নয়।" তার কান দুটো একটু লাল হ'য়ে গেল, গলাটা অযথা একটু ধ'রে গেল।

প্রহেলিকা কিন্তু এত সহজে তাকে ছাড়লো না, সে খুব গম্ভীরভাবে বললে, "তবু এ নিয়ম কি মোটেই খাটে না? অনেক সময় তো দেখা যায় যে, একজন যখন আর একজনকে খুব বেশী ক'রে ভালবাসে, তখন শেষ পর্যন্ত সে লোক তাকে ভাল না বেসে পারে না।"

বাঁড়ুজ্যের অভ্যস্ত রসিকতা প্রহেলিকাকে পড়াবার সময় যেন কোথায় নিখোঁজ হয়ে পালিয়ে যায়। নইলে সে এ কথার রসটাও গ্রহণ করতে পারতো আর একটা বেশ লাগসই জবাবও দিতে পারতো। তা না ক'রে সে কান দুটো আরও লাল ক'রে শুধু জবাব দিলে, "এটা সাইকলজির বিষয়, অঙ্কশাস্ত্রের নয়।"

তবু ছাড়ে না। প্রহেলিকা বললে, "সাইকলজি দিয়ে মনের আকর্ষণ বিকর্ষণের পরিমাণ, গতি বা ক্রিয়া ঠিক Statics dynamics এর মত অঙ্ক ক'ষে বের করা যায় না ?"

বাঁড়ুজ্যে বললে, "বোধ হয় যায় না, কিন্তু আমি জানি না, সাইকলজি কখনও পড়ি নি।"

"আমার ভারী জানতে ইচ্ছে হয়। আমি বোধ হয় ফিলসফি নিলে ভাল করতাম, না ? মানুষের মন কেমন ক'রে কাজ করে, কিসে কি ভাব হয়, কেন কে কি করে, এ সব জানতে পারা যায় নিশ্চয় সাইকলজি প'ড়ে। কি বলেন ?"

"হয়তো যায়।"

"আচ্ছা, আপনার বন্ধুদের মধ্যে সাইকলজি ভাল জানেন এমন কেউ নেই ?"

"হাঁ, আছে বই কি—প্রমোদ ঘোষ Experimental Psychology নিয়ে এম-এ পড়েছিল।"

"প্রমোদ ঘোষ ? ঐ যার 'উড়ো জাহাজ' বিবিক্তায় বের হচ্ছে ?"

"বোধ হয় সেই, তার গল্প লেখাটেখা আসে। আর—হাঁ—সে বলেছিল বটে যে, বিবিক্তায় নাকি তার কি গল্প বের হবে।"

"চমৎকার লিখেছেন তিনি। আচ্ছা তাঁর কি বিয়ে হয়েছে ?"

"না।"

"তবে বোধ হয় মেয়েদের সঙ্গে তিনি খুব মেলামেশা করেন, না ?"

"কই তা' তো জানি না।—আচ্ছা থাক, এখন কাজের কথা হোক, এই আঁকটা কষুন তো।" এ প্রসঙ্গটা বাঁড়ুজ্যের কেমন ভাল লাগছিল না।

প্রহেলিকা কিন্তু বললে, "নইলে মেয়েদের, বিশেষ ক'রে কলেজে-পড়া

মেয়েদের, মনের তলার কথাগুলো তিনি কেমন ক'রে টের পান—যে সব কথা লিখেছেন, ঠিক যেন আমাদের মনের কথা।"

প্রমোদের উপর বাঁড়ুজ্যে হঠাৎ বিষম চ'টে উঠলো মনে মনে। মরিয়া হ'য়ে সে বললে, "কি জানেন, ছোকরা ইদানীং একেবারে ব'খে গেছে। কলেজের কয়েকটা মেয়ের সঙ্গে সে যাচ্ছে-তাই বখামি ক'রে বেড়াচ্ছে।"

গম্ভীর মুখে প্রহেলিকা বললে, "তাই বলুন, আর সে-বেচারীরা সরল প্রাণে তাকে যা' ব'লেছে সেইগুলো হাটের মাঝে ভেঙ্গে ব'লে তিনি বাহবা নিচ্ছেন। বিশ্বাসী মেয়েদের প্রাণের কথা ভাঙিয়ে পয়সা রোজগার করছেন। বেশ লোক তো? আপনার যদি তাঁর সঙ্গে দেখা হয় তো ব'লে দেবেন তাঁকে যে এ ভারী অন্যায়।"

প্রসঙ্গটা জোর ক'রে চাপা দেবার জন্য বাঁড়ুজ্যে বললে, "বলবো। আচ্ছা এখন ক্যালকুলাসটা বের করুন, সেদিন বুঝেছেন তো function এর কথাটা?"

"কিচ্ছু বুঝি নি।"

বাঁড়ুজ্যে তখন প্রাণপণ ক'রে তাকে ক্যালকুলাসের গোড়ার কথা বোঝাতে আরম্ভ করলে।

আর একদিন ইকনমিক্স পড়ার কথা। বইখানা চেপে রেখে প্রহেলিকা বললে, "দেখুন ইকনমিক্স জিনিসটা কিছু নয়। এতে value সম্বন্ধে যা বলে সব ভুল। Value in exchange, value in use সব বাজে, এ ছাড়া আর একরকম ভ্যালু নেই কি? জিনিসের একটা নিজস্ব ভ্যালু আছে যা ঠিক value in useও নয় value in exchangeও নয়, আর সে value টাকা আনা পাই দিয়ে মোটেই হিসেব করা যায় না।"

বাঁড়ুজ্যে এ কথায় একটু ঘেমে উঠলো। এ সব বিষয়ে তার জ্ঞানের পরিধি খুব বিস্তীর্ণ নয়, আর প্রহেলিকা যেমন সব অদ্ভুত প্রশ্ন করে তাতে সে পরিধি সহজেই ছাড়িয়ে গিয়ে এমন জায়গায় তাকে টেনে নিয়ে যায় সেখানে হাবুডুবু খাওয়া ছাড়া তার উপায়ান্তর থাকে না। তাই সে বললে,—

"হাঁ, কোনও কোনও ইকনমিস্টের মতে এমনি একটা নিজস্ব মর্যাদা জিনিসের আছে—যেমন মার্ক্স-এর মতে। কিন্তু সে সব নিয়ে Passএ আপনার মাথা ঘামাতে হবে না। সেকথা বরং আর একদিন আপনাকে বুঝিয়ে বলবো।"

মার্কসের মত সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান তার বিশেষ ছিল না, তাই কথাটা আপাতত চাপা দিয়ে বাঁড়ুজ্যে ভাবলে যে একদিন নিখিলেশের কাছে জিনিসটা ভাল ক'রে বুঝে এসে সে প্রহেলিকাকে বোঝাবে। কিন্তু, বৃথা আশা! প্রহেলিকা বললে,—

"মার্কস্ ছাই বলেছেন। তাঁর মত তো এই যে জিনিসটা করতে কতটা বা কতক্ষণ পরিশ্রম করতে হয়েছে সেইটে তার নিজস্ব ভ্যালু—"

নিজের অজ্ঞাতসারে বাঁড়ুজ্যে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলো। একথা এ মেয়েটা জানে—আর বাঁড়ুজ্যের নিজের এ সম্বন্ধে একটা আবছায়াময় ধারণা ছাড়া কিছুই নেই।

প্রহেলিকা বললে, "কিন্তু আমার একখানা বই আছে, এক বন্ধু সেটা উপহার দিয়েছিলেন, তিনি মারা গিয়েছেন। বইখানার নতুন দাম দশ আনা—এই তার value in exchange, তার value in use কিছুই নয়, কেন না তার ভিতর গোটাকয়েক কবিতা আছে সে আমার মুখস্থ—সুতরাং তা দিয়ে আমার কোনও প্রয়োজন নেই। অথচ আমার কাছে সে বই অমূল্য, একশো টাকা পেলেও আমি তা বেচবো না।

এ ভ্যালু, তার বাজার দরও নয়, ব্যবহারের মূল্যও নয়, শ্রমের পরিমাণও নয়—টাকা আনা পাই দিয়ে এর মাপ হয় না—এ কি বস্তু ?”

যা’ ভেবেছিল তাই। এক প্রশ্নে প্রহেলিকা বাঁড়ুজ্যেকে অথৈ জলে টেনে ফেললে। এর উত্তর বাঁড়ুজ্যে হাতড়ে পেলো না। সে বললে,

“ও সব sentimental value নিয়ে ইকনমিক্স মাথা ঘামায় না, কেন না ওকে কোনও নিয়মের ছকে ফেলা যায় না।”

মনে মনে সে ভাবলে, নিখিলেশের সঙ্গে এই কথা নিয়ে একটা জোর তর্ক অবিলম্বে করতে হবে।

প্রহেলিকা বললে, “কিন্তু ধরতে গেলে এই ভ্যালুটাই আসল ভ্যালু। তা ছাড়া ধরুন একটা মানুষের ভ্যালু কি ? এই ধরুন আপনি। আপনার বাজার দর বা value in exchange মাসে পঁচিশ, কি পঞ্চাশ, কি জোর একশ’ টাকা। কিন্তু বিয়ের বাজারে আপনি হয়তো হাজার টাকার কমে বিকোবেন না, স্ত্রীটি পাবেন ফাউ। আবার যদি কেউ আপনাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে তবে সে সমস্ত বিশ্বের সব সম্পদ বিলিয়ে দিয়েও আপনাকে পেতে চাইবে। এ কী value ?”

এ দারুণ বিপদে উদ্ধারের আশায় যে যুক্তি বাঁড়ুয্যে অবলম্বন করলে দেখা গেল সেটা খড়ের কুটোর চেয়েও অপদার্থ। সে হেসে বললে,

“দেখুন ইকনমিক্সের বিষয় মানুষ কেনা বেচা নয়, মাল—commodity—কেনা বেচা। মানুষ তো মাল নয়। আজকালকার দিনে বাজারের কেনা বেচায় মানুষের আদান প্রদান হয় না।”

“কিন্তু এটা কি ঠিক নয় যে এই মানুষকে পাবার চেষ্টাটাই মানুষের সব চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা ; ভালবাসার চেয়ে বড় জিনিস কিছুই নেই। মানুষ শুধু খেয়ে বাঁচে না, বরং ভালবেসে, ভালবাসা পেয়ে বাঁচে। শুধু খাবার পরবার উপায় নিয়ে জিনিসের দরদাম বাঁধবো তার প্রাণের

দিকটা চাইবো না, এ নিয়ে যদি ইকনমিক্স শাস্ত্র হয়, তবে সেটা ভুল হ'তে বাধ্য।"

প্রসঙ্গটা ভয়াবহ, এ নিয়ে ঘাঁটাতে বাঁড়ুজ্যের সাহসে কুলোয় না, কিন্তু কি জানি কেন, এটা ত্যাগ করতেও সে পারে না।

সে গভীরভাবে চিন্তা ক'রে বললে,

"ঠিক বলেছেন। মানুষ যখন কোনও কিছুর মূল্য নির্ণয় করতে গিয়ে হৃদয়ের দিকটা ভুলে যায়, শুধু তার ভৌতিক জীবনের মাপ কাঠি প্রয়োগ করে, তখন বিচারটা খুবই ভুল হয়ে যায়। তা' থেকে আসে ভুল values আর সেই ভুল values নিয়ে মানুষ মারামারি কাটাকাটি করে—যুদ্ধ করে, মামলা করে, দাঙ্গা করে। মানুষকে এ ভ্রান্তি থেকে মুক্ত করবার জন্যে দরকার নতুন values সৃষ্টি—যার ভিতর তার হৃদয়ের দিকটা হবে প্রধান।"

"অর্থাৎ ভ্যালু জিনিসটা a function of two variables—দুটি হৃদয়। কি বলেন?"

"হয়তো তাই, কিন্তু—"

"হয়তো বলছেন! নিশ্চয় তাই। আমার বোধ হয় আপনার হৃদয় নেই। কখনও ভালবাসেন নি কাউকে। কেমন?"

হৃদয় মানে যদি হৃৎপিণ্ড হয়, তবে সেটা যে তার আছে সে কথা বাঁড়ুজ্যে তখন খুব জোরের সঙ্গেই অনুভব করছিল, কেন না সে যন্ত্রটা তখন তার বুকের ভিতর প্রচণ্ড বিক্রমে হাতুড়ি পিটছিল। কিন্তু তাতে তার এ প্রশ্নের উত্তর দেবার সহায়তা হওয়া দূরে থাকুক তা' একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠলো। খানিকক্ষণ মুখ চেপে থেকে বুকের ধড়ফড়ানিটাকে কায়দা ক'রে সে বললে,

"দেখুন এটা অবান্তর কথা। এর উত্তর, ওর নাম কি—যাকগে সে কথা, এখন বইটে খুলুন—"

খিল খিল ক'রে হেসে উঠে প্রহেলিকা বললে,

"যা ভেবেছি তাই। আপনারা সব একজাত। ভালবাসার কথা মন খুলে প্রকাশ করতে বা আলোচনা করতে কিছুতেই পারেন না আপনারা। আমার অনেক পুরুষ বন্ধুকে পরখ ক'রে দেখেছি— সামনাসামনি কথাটা পাড়লেই তারা সবাই একেবারে হকচকিয়ে যায়। কেন ? ভালবাসেন যদি তবে সে কথা বলতে বাধা কি ? না বাসেন তাই বা বলতে কি দোষ ? এতে অত ভড়কে যাবার কি আছে ?"

যেটুকু আত্মসংযম বাঁড়ুজ্যে বহুকষ্টে সংগ্রহ করেছিল এ কথায় তা' একেবারে চুরমার হ'য়ে গেল। সে স্পষ্ট হাঁপাতে লাগলো, আর গা ব'য়ে ঘাম ঝরতে লাগলো তার। এতে সে নিজের উপর খুব চটে গেল, কিন্তু তাতে বিশেষ উপকার হ'ল না।

তার পর প্রহেলিকা আরও কি কথা বললে, তা' বাঁড়ুজ্যে শুনতে পেলে না। সে মনে মনে তার উত্তরটা তৈরী করতে লাগ্‌লো। অনেকক্ষণ পরে সে তার জবাব দুরস্ত ক'রে বললে,

"যার দাম বা value in exchange মাসে পঁচিশ টাকা তার ওসব ব্যারাম হ'তে নেই।"

"ব্যারাম কি কখনও কারও হ'তে আছে না কি ? ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা এসবও হ'তে নেই, তবু হয় না কি ? ভালবাসাটা যদি ব্যারাম-ই হয়, তবে সেটা হ'তে নেই ব'লে হবে না, এমন কোনও কথা নেই। হাঁ, তবে আপনাকে দেখে মনে হয় বটে যে আপনার হয়তো এ ব্যারাম নাও হ'তে পারে। আচ্ছা কেন হয় না বলুন তো ?"

মেয়েটা দারুণ নাছোড়বান্দা! নাচার হ'য়ে বাঁড়ুজ্যে বললে, "জানি না।"

প্রহেলিকা ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললে, "আমার মনে হয়—না থাক, সে কথা বললে আপনি রাগ করবেন—"

ব'লতেই হ'ল, "না না, রাগ করবো কেন? বলুন।"

"আমার মনে হয় ভালবাসা আপনার কাছে ভিড়তে পারে না আপনার নামের ভয়ে; আচ্ছা আপনাকে হর্যক্ষ বিক্ষোভ নামটা কেন দিলে বলুন তো?"

এই নামটা নিয়ে বন্ধু মহলে বাঁড়ুজ্যেকে অনেক রসিকতা শুনতে হয়েছে, কিন্তু কেউ কোনও দিন রসিকতা ক'রে জিতে যেতে পারে নি তার কাছে। সে তার চেয়ে বেশী রসিকতা ক'রে নামের মর্যাদা রক্ষা ক'রে গেছে, যদিও বন্ধুদের কাউকে এই জিহ্বা-বিক্ষোভকারী নাম উচ্চারণ ক'রতে সে বাধ্য করতে পারে নি। একবার একজন তাকে ডেকেছিল 'কুৎকুতাক্ষ' ব'লে, সেদিন শুধু সে হেসে জবাব দিতে পারে নি, মুষ্ট্যাঘাতে উত্তর দিয়েছিল। তাই তার নামটা বন্ধুমহল যদিও বয়কট করেছিল, তা নিয়ে তারা তাকে সঙ্কুচিত করতে পারে নি।

আজ কিন্তু সে ভয়ানক সঙ্কোচ বোধ করলে তার এই নামের জন্য। যদি সেই মুহূর্ত্তে ব্ল্যাক বোর্ডে চকের আঁকের মত এ নামটা সে ঝাড়ন দিয়ে পুঁছে ফেলতে পারতো, তবে তা' করতো। কিন্তু যেহেতু তা' পারা গেল না তাই সে একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে শুধু, বললে,

"নাম কার কেন হয় তা কি বলা যায়? আপনার নামটাই কি কোন হিসেব ক'রে রাখা হ'য়েছিল?"

হেসে প্রহেলিকা বললে, "কেন আমার নামটা চমৎকার মিলে যায় নি আমার চরিত্রের সঙ্গে? আমার পুরুষ বন্ধুরা তো সবাই বলে যে আমি

সত্যি সত্যিই একটা জীবন্ত প্রহেলিকা, আমাকে বোঝা যায় না। আপনিও নিশ্চয় তাই ভাবছেন। না?”

গম্ভীরভাবে বাঁড়ুজ্যে বললে, “না। কিন্তু অনেকটা সময় বাজে কথায় নষ্ট হয়েছে, এখন দয়া ক’রে বইখানা খুলুন।”

খোলা হ’ল বই—কিন্তু পড়া সেদিন বেশী এগুলো না। খানিকটা অগ্রসর হ’তেই প্রহেলিকা হঠাৎ ব’লে উঠলো, “ইকনমিক্স যদি ঠিক হয়, তবে আমাদের জীবনের পনের আনাই বাজে খরচ। লেখা পড়া, বিশেষত কাব্য সাহিত্য প্রভৃতি, গান বাজনা, সবই বাজে। মানুষের একমাত্র কর্তব্য পেট থেকে প’ড়েই ধন সৃষ্টি করা, সংগ্রহ করা, আর invest করা। একটা বোকা মেয়ের মাথায় ইকনমিক্স ম্যাথামেটিক্স ঢোকাবার বৃথা চেষ্টা না ক’রে আপনার উচিত চাষ করা, কি জুতো সেলাই, কি—আর কিছু না পারেন—একটা মনিহারী দোকান করা।”

বাঁড়ুজ্যে এবার উঠলো। “আজ এই পর্যন্তই থাক।” ব’লে উঠে সে চোঁচা ছুট দিয়ে উঠলো গিয়ে প্রমোদের দোকানে হাঁপাতে হাঁপাতে; সেখানে গিয়ে তিন গ্ল্যাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে একটু ধাতস্থ হ’য়ে সে বললে,

“বাপ্, প্রাইভেট টিউসন কি ঝকমারী। বিশেষ মেয়েদের পড়ান, আর সে মেয়ে যদি হয় আমার ছাত্রীর মত পাগলাগারদের পলাতক বাসিন্দা।”

প্রমোদ অতিকষ্টে তাকে উত্তম মধ্যম দেবার আকাঙ্ক্ষা দমন করলে।

৭

দোকানের দুটি হবু খদ্দের বার বার ঘোরা ফেরা করতে লাগলো। তারা প্রমোদের খাতাপত্র দেখে, জিনিসগুলো নেড়ে চেড়ে দেখে বাজারে যায় দর যাচাই করতে। পরামর্শ করতে যায়, জেঠামশায় পিশেমশায়

প্রভৃতি রাজ্যের মশায়ের কাছে। অনর্থক কথা ব'লে ব'লে হাড় জ্বালিয়ে দেয়। পাকা কথাটা কেউ ব'লে ফেলতে যেন জানে না।

এমনি ক'রে ব'কে ব'কে আরও অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো প্রমোদ। এ আপদ ঘাড় থেকে নামাতে পারলে বাঁচে সে, অথচ এদের সে বিষয়ে গা মোটেই নেই।

আবার দোকানের বিক্রী এত বেড়ে গেল যে দিনরাত লোকের সওদা দিতে দিতে অবকাশই পায় না প্রমোদ আরও চেপে চেষ্টা করবার। যত সব বাজে খদ্দের রাজ্যের বাজে জিনিস কেনবার জন্য যেন ভীড় ক'রে আসতে লাগলো—শুধু প্রমোদের হাড় জ্বালাতে।

শেষে একজন বললেন, "আচ্ছা নেব দোকান যদি দরে পোষায়।"

তিনি দর দিলেন দু'শ' টাকা।

প্রায় হাজার টাকার মাল আছে তার দোকানে, বিক্রী হচ্ছে যথেষ্ট। তাই যতই গরজ থাক প্রমোদের, দু'শ' টাকায় দোকান বেচে দিতে তার মন সরলো না। সে চাইলে হাজার টাকা।

এই নিয়ে পাঁচ সাত দিন আলোচনা চললো। শেষে একদিন অবস্থাটা সঙ্গীন হ'য়ে এলো। প্রমোদ নেমে এলো সাত শ' টাকায়, খরিদ্দার বললে, সাড়ে পাঁচ শো।

কথা কাটাকাটি চলতে লাগলো, কিন্তু নিরপেক্ষ লোক কেউ শুনলে বুঝতো যে বিক্রী হ'তে আর দেরী নেই। কেন না স্পষ্টই দেখা গেল যে, প্রমোদেরও বেচবার যেমন আগ্রহ, খরিদ্দারেরও কেনবার তেমনি গরজ। এ অবস্থায় দেড় শ' টাকার ব্যবধান লঙ্ঘন হওয়া বেশী কষ্টকর হবে না।

খদ্দের বললে, "আমার শেষ কথা ম'শায় ছ'শো টাকা। রাজী হন এখুনি টাকা এনে দিচ্ছি, নগদ।"

প্রমোদ টলমল। আমতা আমতা ক'রে বললে, দেখুন বড্ড লোকসান হচ্ছে। হাজার টাকার তো মালই আছে, তা' ছাড়া দেখছেন তো কেমন বিক্রী হচ্ছে—"

খদ্দের বললে, "কিন্তু আপনার মালের দামের দরুন দেনা—"

"জোর পঁচিশ টাকা। এ অবস্থায়—"

খরিদ্দার বুঝলে যে :টোপ গিলতে আর বেশী দেরী নেই ; আর একটু চার ফেললে। বুক পকেটের ভিতর থেকে সে গুনে গুনে ছ'খানা একশো টাকার নোট বের ক'রে প্রমোদের সামনে ধ'রে বললে,

"তা' বুঝুন। দেন তো এই ছয়শ' টাকা নগদ দিচ্ছি, এখনি একটা রসিদ কেটে ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে যান।"

প্রমোদ মাথা চুলকাতে চুলকাতে, একবার হাত বাড়ায় আবার হাত টেনে নেয় ; এমনিভাবে অনিশ্চিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে—

এলো প্রহেলিকা।

একা।

এসেই বললে, "দুখানা একসারসাইজ বুক দিন তো ?"

প্রমোদ দোকানে একখানা বেশ ভাল চেয়ার রেখেছিল। প্রহেলিকা এসে তাতে বসবে এই আশায়ই সে সেখানা কিনেছিল। সেই চেয়ারে চেপে বসেছিলেন দোকানের সেই হবু খরিদ্দার।

প্রমোদ তাকে বললে, "এখন যান আপনি—উঠুন।"

খরিদ্দার অনিচ্ছুকভাবে উঠি উঠি ভাব ক'রেও চেয়ারে ব'সেই নোট ক'খানা ধ'রে বললেন, "এ টাকা তা হ'লে—"

"নিয়ে যান আপনি, উঠুন এখন—"

"কিন্তু—"

"এখন ওসব কথা হবে না, উঠুন আপনি।"

একরকম ঠেলেই তুলে দিলে তাকে প্রমোদ। তারপর কোঁচা দিয়ে চেয়ারটা ঝেড়ে ফেলে প্রহেলিকাকে বসতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কি চাইলেন আপনি ?"

"একসারসাইজ বুক।"

"হাঁ, একসারসাইজ বুক !"

বুকের ভিতর তার ধুপ ধাপ করতে লাগলো। হাত তার থরথর ক'রে কাঁপছে।

আলমারীর উপরের থাক থেকে একতাড়া খাতা নামাতে গিয়ে অর্ধেক সে ফেলে দিলে মেঝের উপর। সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে প্রহেলিকার কাছে রেখে সে আকুল নয়নে চেয়ে রইল প্রহেলিকার দিকে। প্রহেলিকা খাতাগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলো।

একটা ছোকরা এলো। "এক পয়সার লজেঞ্জস দিন।"

ভারী বিরক্ত হয়ে প্রমোদ একটা বোতল থেকে এক মুষ্টি লজেঞ্জস তুলে তাকে দিলে। যা দিলে সে প্রায় তিন পয়সার মাল, আর পয়সাটা সে তুলতে ভুলে গেল।

আর একজন এলো, একটা পেনসিল নিতে। দিলে প্রমোদ।

তারপর আর দু'জন, একজনের চাই রিবন আর একজনের সেফ্‌টিপিন।

প্রমোদ আর পারলো না সইতে, সে বললে, "এখন হবে না, আর একটু পরে এসো।"

তারা তর্ক করতে চাইলো, প্রমোদ বললে, "নেই, যাও।"

প্রহেলিকার খাতা বাছাই করা হ'য়ে গেল। সে বল্‌লে, "রিবন আছে নাকি আপনার দোকানে ? কেমন রিবন, দেখি ?"

যত রকম রিবন ছিল সব নেমে এলো প্রহেলিকার সামনে। একটা তুলে নিয়ে প্রহেলিকা বল্‌লে, "বেশ সুন্দর এটা, দিন তো তিন গজ।"

প্রমোদের হাত পায়ের কাঁপুনি অসহ্য হ'য়ে উঠলো। তিন গজ রিবন সে কেটে দিলে।

"কত হ'ল ?" প্রহেলিকা জিজ্ঞেস করলে।

দাম বললে প্রমোদ।

পয়সা বের করতে করতে প্রহেলিকা বল্‌লে, "স্নো আছে আপনার দোকানে ?"

"স্নো"—নিশ্চয় আছে—শুধু স্নো নয়, ক্রীম পাউডার পাফ এসেন্স ইত্যাদি যা চাই সব আছে। সব জিনিস সারবন্দী হয়ে কাউণ্টারের উপর জড় হয়ে গেল। দু একটা নিলে প্রহেলিকা।

প্রহেলিকা দিলে একখানা পাঁচ টাকার নোট। তার ভাঙানি দিতে গিয়ে প্রমোদ কিছুতেই হিসাব ঠিক ক'রে উঠতে পারে না। এক টাকায় যে ঠিক ক' আনা হয় এই কথাটাই তার কিছুতে মনে আসতে চায় না। অনেক চেষ্টায় হিসাব ঠিক ক'রে যখন ভাঙানি দিলে সে তখন প্রহেলিকা ক্যাশ মেমো দেখিয়ে বল্‌লে, "এই নাম কি আপনারই ?"

অনাবশ্যক উৎফুল্লতার সহিত প্রমোদ বল্‌লে, "আজ্ঞে।"

"আপনি এম-এ ?—আশ্চর্য তো।"

আশ্চর্য ! কেন আশ্চর্য হবার কি আছে এতে ? প্রমোদের মনে হ'ল বোধ হয় তার চেহারায় এমন কিছু আছে যাতে তাকে নেহাৎ বোকা মনে হয়—অন্তত এম-এ পাশ করবার অযোগ্য মনে হয় তাকে। সে ভারী দমে গেল।

প্রহেলিকা বল্‌লে, "আচ্ছা আপনিই কি—আপনি বিবিক্তায় 'উড়ো জাহাজ' লিখছেন ?"

পরম কৃতার্থতার সহিত প্রমোদ স্বীকার করলে যে সেই সে দীন অভাজন।

প্রহেলিকার মুখ চোখ যেন আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে বল্‌লে, "কি আশ্চর্য! আর আপনি এমনি। ভারী আশ্চর্য!"

সে চ'লে গেল। প্রমোদের চোখ দুটো প্রহেলিকার পিঠের উপর বিঁধে ব'সে তার সঙ্গে সঙ্গে গেল যতদূর তাকে দেখা যায়।

কৃতার্থতায় তার বুক ভ'রে গেল। কিন্তু ঐ প্রহেলিকা বার বার বল্‌লে "আশ্চর্য", তাতে তার মনটা খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগলো। তার চেহারাটা ঠিক এম-এ পাশ অথবা "উড়ো জাহাজ" লেখবার মত নয় কি ?

আলমারি থেকে একটা আরসী বের ক'রে নিয়ে সে নিবিষ্টভাবে তার মুখখানা দেখতে লাগলো। রাজ্যের ত্রুটি ও অভাব যেন তার চোখে বিঁধতে লাগলো।

এলো একটি খদ্দের।

আপদ ব'লে আর তাকে মনে হ'ল না। হাসিমুখে সে সেই খদ্দেরের সব অসম্ভব খুঁৎ খুঁতি ও আব্‌দার সহ্য ক'রে মাত্র চার আনার সওদা বিক্রী করলে।

তারপর এলো তার দোকান কেনবার সেই হবু খদ্দের।

সে এসে বল্‌লে, "কি বলেন প্রমোদবাবু, টাকাটা নেবেন এখন ?"

প্রমোদ মাথা ঝেড়ে জবাব দিলে, "না ম'শায় না, ছশ' টাকায় এই দোকান! ছেলের হাতের মোয়া পেয়েছেন ?"

"যাক গে যাক, আর পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি, আর কথা কইবেন না।"

প্রমোদ বল্‌লে, “উঁহুঁ।”

আরও কিছুক্ষণ বকাবকির পর শেষ পর্যন্ত লোকটা আর একখানা একশো টাকার নোট বের ক’রে বল্‌লে, “আচ্ছা নিন, আপনার কথাই রইল, এই সাতশ’ নিন, আর পঞ্চাশ টাকা? আচ্ছা তাও বিকেলে দেব। নিন।”

“না ম’শায় না। বেচবো না আমি দোকান। সাড়ে সাতশ’ কোন্ ছার, সাড়ে সাত হাজার দিলেও বেচবো না।”

লোকটা অবাক হয়ে বল্‌লে, “বা রে, আপনিই তো বললেন সাড়ে সাতশ’—আবার এখন কথা পাণ্টাচ্ছেন।”

“হাঁ পাণ্টাচ্ছি। আমি বেচবো না দোকান।”

“কেন বলুন তো।”

“ইচ্ছে।”

“আচ্ছা যাক, আর কিছু বেশী চান তো তাই বলুন।”

প্রমোদ বল্‌লে, “না মশায়, বেশীও চাই না কমও চাই না, কিছুই না। বেচবো না আমি।”

“তবে কেন নাহক আমাকে হয়রানি করলেন এতদিন?”

“বেশ করেছি—আমার খুসী আমি করেছি। এখন উঠুন, বিদায় হ’ন।”

লোকটাকে একরকম ধাক্কা দিয়ে বের ক’রে দিয়ে প্রমোদ সেই চেয়ারখানায় ব’সে চোখ বুজে মনে মনে পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো আজ যে মহাসৌভাগ্য হয়ে গেছে তার। প্রহেলিকা দোকানে আসবার পর থেকে যা কিছু হয়েছে তার খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ ক’রে তার উপর অপূর্ব ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচনা ক’রে সে তখন স্বর্গলোকে বিচরণ করতে লাগলো।

প্রহেলিকার মায়ামূর্তি নানা ভাবে নানা ভঙ্গীতে তার চারিদিকে বিচরণ ক'রে তার দোকানঘরখানা হুরীবিশোভিত বেহেস্তে পরিণত ক'রে দিলে। সে স্বপ্ন দেখতে লাগলো, আজকের এই পরিচয় যে শুভারম্ভের সূচনা করলে তার পরিণতি শঙ্খমুখরিত এক মধুর সন্ধ্যায়, কুসুমাস্তীর্ণ এক সুশোভন শয্যায়—

"এই প্রমোদ, রাস্কেল, তুই এখানে ?" উচ্চকণ্ঠে শ্রীবিলাস এই সম্ভাষণ ক'রে এইখানে তার স্বপ্নের স্রোত ভেঙ্গে দিলে।

৮

শ্রীবিলাসের সম্ভাষণে প্রমোদ রাগ করলে না। সে একেবারে লাফিয়ে উঠে তাকে প্রবল বেগে আলিঙ্গন ক'রে ফেল্‌লে। এতটা আবেগ সে দেখালে যে শ্রীবিলাস হকচকিয়ে গেল।

শ্রীবিলাসের সঙ্গে তার দেখা নেই এক বৎসরের উপর। সে হঠাৎ কি ক'রে উদয় হল, এতদিন সে কি করছিল, এখনি বা কি করে, সে সুখে আছে কি দুঃখে আছে সে সব অবান্তর কথা এখন তার একবারও মনে হল না। সে বলতে গেলে কেবল তার চারদিক ঘিরে লাফাতে লাগলো, আর কথা যা বল্‌লে সে খুব সুসংলগ্ন নয়। যথা—

"এই যে শ্রীবিলাস—হ্যাঁ-হ্যাঁ—বেশ বেশ—খুব ভাল। কি যে খুসী হয়েছি কি বলবো—তারপর—শ্রীবিলাস তুমি—কি আশ্চর্য—দেখ এ পৃথিবীটা ভারী আশ্চর্য, না ?—কি বল ?"

শ্রীবিলাস কি বলবে ভেবে পেল না। তার বন্ধুর এ ব্যবহার দেখে সে শুধু হাঁ ক'রে চেয়ে রইলো।

"চল ভাই তোমাকে আজ কিছু খেতে হবে," ব'লে তাড়াতাড়ি

দোকান বন্ধ ক'রে সে শ্রীবিলাসকে টেনে নিয়ে গেল একটা রেস্টরেণ্টে। সেখানে রাজ্যের খাবারের ফরমায়েস দিয়ে বসলো।

তারপর খেতে খেতে সে বললে, "নিখিলেশের সঙ্গে দেখা হয়েছে? হয় নি? সে হতভাগা কেমন বোকা মেরে গেছে—কিছু সুবিধে করতে পারছে না। আমি ঐ ছোট্ট দোকান ক'রে বসেছি। জান তো, বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী! হাঁ কথাটা বেজায় ঠিক—লক্ষ্মী, একেবারে জ্যান্ত লক্ষ্মী, বুঝলে কি না?—আর একটা অমলেট? খাবে না? সে কি? খেতেই হবে—এই বয়, লে আও আর একঠো অমলেট। পয়সা খরচের কথা ভেবো না, আমার পয়সার কোনো চিন্তা নেই—লক্ষ্মী—লক্ষ্মী যাকে কৃপা করেন তার আর দুঃখ কি?"

খাবার পর শ্রীবিলাসকে টেনে নিয়ে চল্‌ল সিনেমায়। একটা সিনেমায় গিয়ে শুনতে পেলে তিন টাকার কম টিকিট সব বিক্রী হয়ে গেছে। "কুছ পরোয়া নেই" ব'লে সে দুখানা টিকিট কিনে ব'সল গিয়ে দোতলায়।

যতক্ষণ ছবি আরম্ভ না হ'ল ততক্ষণ সে অনর্গল বকতে লাগলো।

ক্রমে সে একটু আত্মস্থ হ'তে জিজ্ঞেস করলে, "তারপর তুমি এখন আছ কোথায়?"

শ্রীবিলাস বললে, "তোমার পাশে, সিনেমায় ব'সে।"

হো হো ক'রে হেসে প্রমোদ বল্‌লে, "সে তো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সে কথা জানতে চাই নি। জানতে চাই কোন বন থেকে বেরিয়ে এ টিয়েটি কলকাতায় উদয় হ'য়েছে?"

"পাবনা জেলার অন্তর্গত জাঁহাবাজপুর গ্রাম থেকে।"

"ও তা হ'লে তুমি দেশেই আছ। আশ্চর্য্য তো? কোনও কাজকর্মের চেষ্টা না ক'রে ঠায় গাঁয়ে ব'সে আছ।"

"কেন, গাঁয়ে কি কাজকর্ম হয় না? অনেক লোক গাঁয়ে থাকে আর কাজকর্মও করে। আমিও করছি। আর তাতে ক'রে সামান্য দু' পয়সা উপায়ও ক'রছি।"

ক্রমে শ্রীবিলাস বেশ দর্প ক'রেই তার গ্রাম্য কর্মজীবনের বিস্তীর্ণ পরিচয় দিয়ে গেল, আর সেই পরিচয় প্রসঙ্গে সে দশ বারো বার শহরবাসী ভাগ্যান্বেষীদের প্রতি যথেষ্ট অনুকম্পামিশ্রিত অবজ্ঞা প্রকাশ করলে। বল্‌লে সে, গ্রামে লক্ষ্মীর বাসা বাঁধা আছে। সেখানে চক্ষের নিমিষে ক্রোড়পতি না হতে পার কিন্তু কাজ করতে জানলে বেশ দু' পয়সা উপায় হয় আর যা উপায় হয় তাতে ভাল খেয়ে প'রে আরামে থাকতে পারা যায়—শহরের এই দমফাটান হুটোপুটির মধ্যে আলেয়ার সন্ধানে ছুটোছুটির চেয়ে সে হাজার গুণে ভাল।

শ্রীবিলাসের ইতিহাস সংক্ষেপে জেনে রাখা দরকার। সে সেই যে প্রতিজ্ঞা করেছিল লক্ষ্মীর সন্ধান না ক'রে ত্যাগের ব্রত গ্রহণ ক'রবে, সেই ঝোঁকের মাথায় সে কংগ্রেসসেবী হ'য়ে খদ্দর প'রে বেরিয়ে পড়েছিল। পল্লী সংগঠন ও খাদি প্রচারের মহাব্রত গ্রহণ ক'রে সে কিছু থোক টাকা ও মাসিক সামান্য বৃত্তি নিয়ে গাঁয় গিয়ে বসলো।

তখন তার খেয়াল হ'ল যে পল্লীসংগঠনের প্রথম কাজ গ্রামবাসীদের জীর্ণ বাসগৃহগুলির উন্নতি করা। তাই তার হাতে যে থোক টাকা ছিল তা' দিয়ে নিজের ঘরখানা বেশ ভাল ক'রে ঠিক ক'রে নিলে।

গ্রামে এক স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ক'রে সে ক্রমে তাদের সহায়তায় তার বাড়ির আশপাশের ডোবা বুজিয়ে তার বাড়ি যাবার পথ ঘাট দুরস্ত ক'রে ফেললে। তার পর আরও টাকা এনে সে পাটের ব্যবসা সংগঠনে মনোযোগ দিলে। এক বছরের ভিতর সে বিস্তর লাভ ক'রে ফেললে।

তারপর তার বৈরাগ্যের ঝোঁকটা হঠাৎ কেটে গেল। পাটের ব্যবসায় ছলছলে টাকা দেখে সে লক্ষ্মীরই পক্ষপাতী হ'য়ে উঠলো। আর সেই সময় কংগ্রেস কমিটি তার কাছে টাকার হিসাব চাওয়ায় সে চ'টে মটে কংগ্রেস থেকে নাম কাটিয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার ও ক্রমে প্রেসিডেণ্ট হয়ে বসলো।—এবারে সে রায়সাহেব খেতাব পাবার আশা রাখে।

সিনেমায় যে ছবিখানা হচ্ছিল প্রমোদ তা ভাল ক'রে দেখলোই না। শ্রীবিলাসের আত্মচরিতেরও খুব অল্প অংশই তার কানে গেল। তার মনের ভিতর দিয়ে এক অপূর্ব্ব পুলকের স্রোত ব'য়ে যেতে লাগলো আর সে স্রোতে ভেসে চললো কাতারে কাতারে নানা মনোজ্ঞ স্বপ্ন যার সামনে পেছনে ও চারধারে ছাপমারা ছিল প্রহেলিকার মুখ।

তার নাচতে ইচ্ছে হচ্ছিল—সিনেমার বাজনার তালে তালে সে ব'সে ব'সে যতদূর সম্ভব নাচছিলও! ইণ্টারভাল এসে গেল। বাতিগুলো জ্বলে উঠলো। শ্রীবিলাসকে টেনে প্রমোদ নিয়ে গেল চা খাওয়াতে।

তার পর ফিরে এসে যখন সে ব'সতে গেল তখন নীচের অডিটোরিয়ামের দিকে চেয়ে সে যা দেখলো তাতে তার বুকের ভিতর দারুণ উল্লাস ও আপশোষ একসঙ্গে চাড়া দিয়ে উঠলো।

—সে দেখলে, সেখানে ন' আনার সীটে ব'সে আছে—স্বয়ং প্রহেলিকা!

প্রহেলিকাকে দেখা যাচ্ছে এতে হ'ল উল্লাস—কিন্তু হায়, সে কেন আগে জানতে পেলো না—তা হ'লে মিছে পৌণে সাত টাকা খরচ ক'রে এতখানি ব্যবধান সহ্য না ক'রে সে তো জো সো ক'রে ন' আনার সীটে ঠিক প্রহেলিকার পাশেই ব'সতে পারতো। তা হ'লে—তা হ'লে যে কি হ'তে পারতো সে সম্ভাবনার কল্পনায় সে আত্মহারা হ'য়ে গেল।

তার পর—

ও কি ?—

প্রহেলিকার পাশের সীটে বসেছে একজন—প্রমোদ ভাবলে কি ভাগ্যবান সে! অথচ হায়, সে অভাগ্য হয় তো এ সৌভাগ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন!

কিন্তু—

লোকটাকে তো ঠিক অচেতন ব'লে মনে হচ্ছে না! সে মাঝে মাঝে কথা কইছে প্রহেলিকার সঙ্গে। —আবার নোনতা বাদাম কিনে দিচ্ছে সে তাকে।—হিংস্র দৃষ্টিতে তার পশ্চাদ্ভাগের দিকে চেয়ে প্রমোদ ভাবলে, কে লোকটা ?

লোকটা একবার মুখ ফেরালে। তখনি বাতি নিভে গেল।

এর পর যে এক ঘণ্টা ছবি দেখান হ'ল তাতে প্রমোদ না কইলে একটা কথা, না দেখলে ছবি। সে স্বধু সাস্থূয় তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো নীচের সেই আসনের দিকে—যেন জোর ক'রে সেই অন্ধকার ভেদ ক'রে লোকটাকে সে দেখবেই।

লোকটার উপর দারুণ জিঘাংসায় তার মনে যেন ঝড় বইতে লাগলো।

সেই মস্ত লম্বা এবং সম্পূর্ণ অনাবশ্যক এক ঘণ্টা অত্যন্ত ঢিমে চালে চ'লেও শেষে শেষ হ'ল!

বাতিগুলো জ্বলে উঠলো। সবাই উঠে দাঁড়াল।—প্রমোদও দাঁড়াল —তার চোখটা সেই নীচের সীটের উপর নিবদ্ধ!

দেখলে প্রমোদ।

"হা ভগবান" ব'লে সে ধপ ক'রে ব'সে পড়লো আবার। সে লোক আর কেউ নেয়—নিখিলেশ!

চুরমার—ছত্রছন্ন হ'য়ে গেল প্রমোদের এতক্ষণকার রচিত মায়াজাল।

শ্রীবিলাস যে পাশে আছে সে খেয়ালই তার রইলো না। সে উঠে ভিড় ঠেলে ছুটলো বাইরের দিকে।

যখন গেটের কাছে এলো তখন সে দেখতে পেলে প্রহেলিকা সেই অপ্রাসঙ্গিক বুড়ো ভদ্রলোকের সঙ্গে ট্যাক্সি চ'ড়ে চলেছে—সেই বুড়ো ভদ্রলোক যার সঙ্গে সে একদিন বাসে চ'ড়েছিল। নিখিলেশকে দেখতে পেলে না।

প্রমোদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু গা কামড়াতে লাগলো।

৯

"ও নাম-না-জানা ম'শাই।"

লেকের ধারে প্রায় সম্পূর্ণ নির্জন অংশে যখন নিখিলেশ অত্যন্ত অপ্রসন্নভাবে বেড়াচ্ছে তখন পিছন থেকে এই শব্দ এসে নিখিলেশের ভিতর এমন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে দিলে যে সে চকিতে ঘুরে দাঁড়াল।

সে বেরিয়েছিল যথারীতি বিকেল বেলায় এবং সেই মণিহারী দোকানের সামনে ঝাড়া দু ঘণ্টা পায়চারী ক'রে যখন কিছুতেই প্রহেলিকার দেখা পাওয়া গেল না এবং আজ নিয়ে সমানে সাতদিন এই দুর্ঘটনা ঘটা দেখা গেল, তখন সে হতাশভাবে চ'লে এসেছিল লেকে; একটা হতাশের আশা নিয়ে যে এখানে হয়তো তার দেখা পেলেও পেতে পারে।

রোজই যে নিখিলেশের এ অভিযান সার্থক হ'ত এমন কখনই হয় নি। কিন্তু দু'দিন কি বড় জোর চারদিনের সাধনায় প্রায়ই দেখা হ'ত। কিন্তু ইদানীং চার দিনও পেরিয়ে যায় দেখে সে আকুল হ'য়ে সেদিন

সিনেমায় গিয়েছিল তার দুঃখ ও নৈরাশ্য একটা ট্রাজেডী দেখে উপভোগ করবার জন্যে। সেখানে গিয়ে তার হয়েছিল আছাড়ে পদ্মলাভ! তার অন্তরের বেদনার অনুভূতিকে যথোচিত নিবিড় ক'রে মুখের উপর একরাশ মানসিক কালি লেপে দিয়ে যখন সে মনের ভিতর আসন্ন ট্রাজেডীর ছবি দেখবার জন্য জমী সম্পূর্ণ তৈরী ক'রে এনেছে তখন হঠাৎ তার পাশের সীটে এসে বসলেন একটি মহিলা। সে তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করলেও মনের বৈরাগ্যের নিবিড়তা পরিপূর্ণরূপে তাজা রাখবার জন্যে সেদিকে অনেকক্ষণ চাইলে না। যখন চাইলে শেষে—তখন অমনি সমস্ত শরীর মন চাঙ্গা হয়ে উঠলো। দেখলে পাশে ব'সে আছে প্রহেলিকা।

সে যে তখনি তাকে একেবারে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ ক'রে ফেললো না, তার কারণ তার স্বভাবভীরুতা, সিনেমায় একরাশ অনাবশ্যক লোকের অস্তিত্ব, প্রহেলিকার মনে কি রকম সাড়া পাওয়া যাবে সে বিষয়ে সুপ্রচুর সন্দেহ প্রভৃতি—নিখিলেশের আকাঙ্ক্ষার অভাব নয়। তখনি যে সে তাকে আবেগভরে সম্ভাষণ করলে না, তার প্রধান কারণ প্রহেলিকার অপর পার্শ্বের লোকটির সেরূপ কার্যের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা।—সে তাই নীরবে কিন্তু প্রচুর অন্তশ্চাঞ্চল্যের সহিত ব'সে বিচার করতে লাগলো ঠিক কি করা যায়?

—এ সুযোগ ছাড়া যায় না।

—আজই একটা এস্পার ওস্পার করতেই হবে। কেবল ঠিক করতে পারলে না এস্পার বা ওস্পার কোনও পারে যাবার প্রণালীটা।

সেই বিচার ক'রতে ক'রতে হয়তো সেখানে নীরবেই সে রাত কাটিয়ে দিত, কিন্তু ছবির অবসরকালে বাতি জ্বলে উঠলো এবং প্রহেলিকাই বিশেষ চমৎকৃত এবং উল্লসিত কণ্ঠে ব'লে বসলে "এই যে আপনি!"

তখন তার সমস্ত অন্তর হঠাৎ আনন্দে লাফিয়ে উঠলো, মুখখানিও সফলতার হাস্যে উজ্জ্বল হ'য়ে গেল। কিন্তু সে বল্‌লে স্বধু—"অ্যাঁ—হ্যাঁ —হ্যাঁ।" বলবার মত আর কোনও কথাই তার মনে এলো না।

খুব হেসে প্রহেলিকা বল্‌লে, "খুব উৎসাহ তো আপনার! এখানেও পিছু নিয়েছেন।"

কথাটায় যে খোঁচা আছে সেটা মিথ্যা। অতএব নিখিলেশ প্রতিবাদ করতে বাধ্য হ'ল। সে বল্‌লে, "না, না, ও কি বলছেন? আমি জানতামও না যে আপনি এখানে আসবেন।"

প্রহেলিকা বল্‌লে, "সত্যি বলছেন?"

"নিশ্চয়।"

বেশ একটু অভিমানের স্বরে প্রহেলিকা বল্‌লে, "তবে আর আপনি কি? আমি ভেবেছিলুম যে আপনি ঘরে ব'সে ব'সেই telepathyতে জানতে পান যে আমি কখন কোথায় থাকবো! এ নইলে gallant?"

হঠাৎ এ উল্টো স্বরে নিখিলেশ একটু দমে গেল। তার পর সাহস ক'রে সে বল্‌লে, "ইচ্ছা তাই হয়, কিন্তু সে সৌভাগ্য আমার হয় না। আন্দাজে অনেক ভুল হয়।"

"যা' হ'ক, ইচ্ছে হয় তবু ভাল। আচ্ছা ছবিটা কেমন লাগছে আপনার?"

এ বিষয়ে অভিমত দেবার অধিকার ছিল না নিখিলেশের, কেন না সে ছবি দেখেওনি এতক্ষণ, তার কোনও কথাও শোনে নি। তবু সে বল্‌লে, "খুব ভাল লাগছে।"

"ছাই!" ব'লে প্রহেলিকা মুখ বিকৃত করলে।

আবার নিখিলেশ নিভে গেল। আমতা আমতা ক'রে সে বল্‌লে,

"অবিশ্যি একেবারে প্রথম শ্রেণীর নয়, তবু হাজার হোক গ্রেটা গার্ব্বো—"

"উঃ! ও মেয়েটা আমার দু চক্ষের বিষ। যেমন দেখতে হাড়গিলের মত, তেমনি হে'ড়ে গলা। আর acting? যেন মড়া ব'য়ে নিচ্ছে! ও কি ছাই!"

নিখিলেশের ভিতর যে প্রচণ্ড তার্কিক থাকে সে এতক্ষণ মোহমুগ্ধ ও আচ্ছন্ন হয়েছিল, কিন্তু একথায় সে হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে চাঙ্গা হ'য়ে উঠলো। গ্রেটা গার্ব্বো সুন্দর কি অসুন্দর, সে অভিনেত্রী ভাল কি মন্দ এ কথাটার জন্য সে অন্য সময় হয়তো মাথা ঘামাত না, কিন্তু সে সম্বন্ধে সে একটা মত প্রকাশ করেছে এবং তাতে প্রতিবাদ এসেছে। এ অবস্থায় তর্ক না ক'রে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। সে খুব ঝোঁকের সঙ্গে বল্‌লে, "আপনি কি বলেন? গ্রেটা গার্ব্বো—বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী, তার সম্বন্ধে কোনও দুইমত থাকতে পারে না। তার সৌন্দর্য ঠিক সাধারণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড দিয়ে বিচার করলে হয়তো খাটো ক'রে দেখবেন, কিন্তু যাঁরা সৌন্দর্যজ্ঞানের রীতিমত কালচার করেছেন তাঁদের চোখে তার রূপ অসামান্য; তা ছাড়া তার ভিতর যে glamour আছে—"

"Glamour! সে আবার কি? আচ্ছা, আমার চেহারায় glamour আছে?"

হেসে নিখিলেশ বল্‌লে, "অত্যন্ত বেশী। এত বেশী যে—"

"প্রায় গ্রেটা গার্বোর ক'ড়ে আঙ্গুলের ধাক্কা—কেমন?"

এ রকম লোকের সঙ্গে তর্ক করা কঠিন। তুমি গেলে ধনুক বাণ নিয়ে, চাই কি তলোয়ার নিয়ে শাস্ত্রসঙ্গতভাবে যুদ্ধ করতে, আর তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী কোনও শাস্ত্রের ধার না ধেরে তোমার পাঁয়তাড়ার মাঝখানে ঘটোৎকচের মত একটা গাছ নিয়ে ধাঁই ক'রে তোমার মাথায় বাড়ি

মেরে বসলো, এতে কি যুদ্ধ চলে? নিখিলেশের মনে হ'ল কতকটা সেই রকম। তর্কযুদ্ধের উদ্যোগপর্বেই হ'য়ে গেল তার অপঘাত।

কি আর ক'রবে? সে স্বধু হাসলে।

প্রহেলিকা বল্‌লে, "আপনার পাশে আমি না ব'সে যদি বসতো ধরুন গ্রেটা গার্বো, তা হ'লে আপনি কি ক'রতেন? নিশ্চয় এক শিশি নোনতা বাদাম কিনে তাকে উপহার দিতেন। কেমন?"

একটা ভেণ্ডার নোনতা বাদাম নিয়ে তাদের সামনে এসে পড়েছিল। নিখিলেশ তাই ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে একশিশি বাদাম কিনে কম্পিত হস্তে প্রহেলিকাকে দিলে।

শিশিটা খুলে প্রহেলিকা বাদাম বের ক'রে কয়েকটা নিখিলেশকে দিলে, কয়েকটা নিজের মুখে পুরে দিলে আর কয়েকটা তার অপর পার্শ্বের লোকটিকে দিয়ে তার সঙ্গে কথা কইতে লেগে গেল।

তখনি বাতি নিভে গেল, ছবি আবার আরম্ভ হ'ল। যখন শেষ হ'য়ে গেল তখন নিখিলেশের সঙ্গে একটি কথাও না ব'লে প্রহেলিকা অপর লোকটির সঙ্গে স্বড় স্বড় ক'রে বেরিয়ে গিয়ে গাড়ীতে উঠলো।

নিখিলেশ হাঁ ক'রে চেয়ে রইল স্বধু।

ভারী চ'টে গিয়ে নিখিলেশ প্রতীক্ষা ক'রতে লাগলো মেয়েটার সঙ্গে আবার সাক্ষাতের। কিন্তু একাদিক্রমে সাত দিন সেই মণিহারী দোকানে পাহারা দিয়েও দেখা না পেয়ে আজ হতাশ চিত্তে লেকের সব চেয়ে নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে অস্তমান সূর্যের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল।

হঠাৎ সেই পরিচিত কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ল, "ও নাম-না-জানা ম'শাই।"

ধাঁ ক'রে মুখ ফিরিয়ে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে তার অনেক মুসাবিদা করা এক বক্তৃতা করবার মুখে সে থমকে গেল। প্রহেলিকা একা নেই, তার সঙ্গে আছে আর একটি লোক। হয় তো মহিলা, হয় তো যুবতী, হয় তো সুন্দরী ; কিন্তু সেদিকে তার দৃষ্টি ছিল না, সে দেখলে সুধু আর একটি মানব—তার আবেগের মুখে মূর্তিমান বিঘ্ন !

আর সে দেখলে, প্রহেলিকা আজ হাসছে না। তার মুখ গম্ভীর, যেন বিষাদে আচ্ছন্ন ! এই অনৈসর্গিক ব্যাপারে তার বুকের ভিতর চড়াৎ ক'রে উঠলো।

সে কিছু বলবার সুবিধা হবার আগেই প্রহেলিকা বল্‌লে, "আপনাকেই খুঁজছিলাম।"

কৃতার্থ ও ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে নিখিলেশ বল্‌লে "কেন বলুন তো ?"

"বড় বিপদে প'ড়েছি।"

নিখিলেশ ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে "কি বিপদ ?"

"চলুন বলছি" ব'লে প্রহেলিকা গম্ভীরভাবে নীরবে কিছুক্ষণ নিখিলেশের সঙ্গে অগ্রসর হ'ল।

অনেকক্ষণ পর সে বল্‌লে, "আমার বাবা—"

বিচার ক'রে দেখলে নিখিলেশ অবশ্যই বুঝতে পারতো যে প্রহেলিকার বাবা, মা, পিশি, মাসী, সর্দি, কাশি প্রভৃতি সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন আনুসঙ্গিক উপসর্গ থাকা সম্ভব। কিন্তু এ পর্যন্ত এসব উপদ্রবের কথা তার মনের আশ পাশেও আসে নি। তার কাছে প্রহেলিকা ছিল প্রহেলিকা—ক'লকাতার জনসমুদ্রমন্থনে উদ্ভূত এক অভিনব উর্বশী। তার বাবার কথাটা যেন তাকে ধাক্কা দিলে। সে বল্‌লে, "হাঁ আপনার বাবা—"

"পশ্চিমে সামান্য মাইনেয় চাকরী করেন।"

অবশ্যই করতে পারেন এবং করতে থাকুন তিনি, কিন্তু তাঁর এমনি সময়ে হঠাৎ নিখিলেশ ও প্রহেলিকার মাঝখানে এমনি একটা অপ্রাসঙ্গিক ব্যবধান হ'য়ে দাঁড়াবার কোনও প্রয়োজন নেই।

"তিনি আমার বিয়ের জন্য বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।"

উত্তেজিত কণ্ঠে নিখিলেশ বল্‌লে, "ভারী অন্যায়!"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে প্রহেলিকা বল্‌লে, "অন্যায়? অন্যায় কিসে? আমার বিয়ে হওয়া অন্যায়?"

তার স্বরের তীব্রতায় নিখিলেশ ঘাবড়ে গিয়ে খানিকক্ষণ আমতা আমতা ক'রে শেষে বল্‌লে, "তা নয়, কিন্তু আপনার বিয়ে নিয়ে তাঁর মাথা ঘামান অন্যায়—আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে—"

"গোল্লায় যেতে পারি, কিন্তু বাপ হ'য়ে তিনি তার কোনও প্রতিকার ক'রবেন না, এই ব'লতে চান?"

এর একটা ঠিক যুক্তিসঙ্গত এবং লাগসই উত্তর ঘণ্টাখানেক সময় পেলে নিখিলেশ দিতে পারতো। কিন্তু সে সময় সে পেলে না। সে নীরবেই রইলো। প্রহেলিকা তাকে কিছুই বলবার সময় না দিয়ে বল্‌লে, "থাক গে, তিনি ভারী ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। কিন্তু তিনি গরীব, টাকা পয়সা দেবার উপায় নেই তাঁর। আর আমিও তেমন সুন্দর নই। অথচ অপেক্ষাও ক'রতে পারছেন না। মাসখানেক বাদে তিনি সরকারী কাজে একবার কলকাতায় আসবেন, দিন পোনেরো থাকবেন। এর ভিতরই আমার বিয়ে দিয়ে যেতে চান।"

এ বক্তৃতার মাঝখানে অনেকবার বাধা দিয়ে অনেক কথা বলবার ইচ্ছে হয়েছিল নিখিলেশের, কিন্তু আবার কি বল্‌লে মেয়েটা কি ভেবে বসবে তাই সে চুপ ক'রেই রইলো। এতক্ষণে সে বল্‌লে, "তা সে আর শক্ত কি?"

গম্ভীরভাবেই প্রহেলিকা বল্‌লে, "শক্ত কিছুই নয়, স্থধু বরের জোগাড় নেই। তাই ভারী বিপদে পড়েছি। ভাবছিলাম আপনি হয় তো একটা সাধারণ চলনসই গোছ বরের সন্ধান দিলেও দিতে পারেন। তাই আপনাকে খুঁজছিলাম।—পারেন কি? খুব ভাল বর আর আমার কোথ্‌থেকে হবে—বিশেষ বাবা যেখানে গরীব—এই সামান্য লেখাপড়া জানে, টাকা পঞ্চাশেক রোজগার করে, এমনি বর দিতে পারেন?"

এমন একটা বেপরদা কথা যে কোনও মেয়ে হঠাৎ একটি স্বল্পপরিচিত যুবককে বলতে পারে একথা কানে না শুনলে নিখিলেশ বিশ্বাস করতো না। আর ঠিক বহাল-তবিয়তে কথাটা শুনলে হয়তো তার প্রথমেই মনে হ'ত সে স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু নিখিলেশ ভাবছিল সে পরীস্থানে—এখানে অসম্ভবটাই একমাত্র সম্ভব। তাই এসব নিতান্তই স্বাভাবিক মনে হ'ল। তাছাড়া যথোচিত চমকিত হবার অবসর তার হ'ল না, কেন না তার আকুল আগ্রহ তাকে ঠেলা মারতে লাগলো এই কথাটাই সর্বাগ্রে বলতে যে সে বর তার নিজের ভিতরই মজুত আছে, স্থতরাং যে কোনও তারিখে বিবাহ হ'তে কোনও বাধা নেই।

কিন্তু সে কথা তার বলা হ'ল না।

এই কথা হ'তে হ'তে তারা এসে পড়েছিল ক্লাব ঘরের সামনে। ক্লাবের গেট থেকে সেই অপ্রাসঙ্গিক বুড়ো ভদ্রলোক "হ্যালো Riddle," ব'লে তাকে সম্ভাষণ করতেই প্রহেলিকা ছুটে তার কাছে চ'লে গেল।

নিখিলেশের সময় হ'ল স্থধু এইটুকু বলবার, "খবর পেলে, কোথায় কখন জানাব?"

প্রহেলিকা মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে "২৫নং গোল্লাপাড়া লেন—আমার বাবা সতীশচন্দ্র বোসের নামে চিঠি দেবেন।"

ব'লেই সে গেটের ভিতর চ'লে গেল। নিখিলেশ হাঁ ক'রে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো।

প্রহেলিকার সঙ্গিনী তাকে গুতো মেরে বল্‌লে, "পোড়ারমুখী!"

প্রহেলিকা গম্ভীরভাবে বল্‌লে, "কেন?"

"এ সব কি হ'ল?"

প্রশান্তভাবে উত্তর হ'ল, "প্রহেলিকা!"

নিখিলেশ তখনি বাড়ি গিয়ে সতীশচন্দ্র বোসকে চিঠি লিখলে যে সে তাঁর কন্যার পাণিপ্রার্থী; এবং নিজের যোগ্যতার সম্পূর্ণ পরিচয় সে চিঠিতে দিয়ে দিলে। এম-এ পাশ করবার পর থেকে সে অনুমান গণ্ডা দশেক চাকরীর দরখাস্ত করেছে; অভ্যাসবশে সেই সব দরখাস্তের ভাব এবং ভাষা এই চিঠিতে তার আত্মপরিচয়ের ভিতর প্রবেশ ক'রে গেল।

১০

বিকেল বেলায় যখন বাঁড়ুজ্যে নিয়মিতভাবে প্রহেলিকাকে পড়াতে এলো তখন সে দেখতে পেলে যে, সে বাড়ির বৈঠকখানায় প্রচুর লোকের সমাবেশ। বাড়ির কর্তা চৌধুরী ম'শায় ও তাঁর দুই দফা পুত্র তো ছিলেনই তা ছাড়া আরও কতকগুলি লোক ছিল যাদের বাঁড়ুজ্যে চেনে না। আর ছিল শ্রীবিলাস!

শ্রীবিলাসকে এতদিন পর দেখে বাঁড়ুজ্যের বিপুল দেহ যেন আরও প্রসারিত হ'য়ে গেল। সে বল্‌লে, "এই যে, শ্রীবিলাস কোথা থেকে?"

শ্রীবিলাস সুধু বল্‌লে, "এই যে বাঁড়ুজ্যে!"—একটু ভারিক্কি চালে —প্রায় মুরুব্বিয়ানার ধাক্কা!

বাঁড়ুজ্যে সুড় সুড় ক'রে পাশের ঘরে পড়াতে যাচ্ছিল। কর্তা বল্‌লেন, "আপনি একটু এখানে বসুন মাষ্টার ম'শায়।"

বাঁড়ুজ্যে মজলিসের দূর সীমানায় ব'সে পড়লো, নিস্পৃহ ও নির্লিপ্ত ভাবে।

কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ সস্পৃহ ও অবলিপ্ত হ'য়ে উঠলো, যখন কথায় বার্তায় সে বর্তমান মজলিসের আলোচ্য বিষয়ের পরিচয় পেলো।

বিয়ের কথা হচ্ছিল।

—শ্রীবিলাসের সঙ্গে বিয়ে।

শ্রীবিলাস স্বয়ং বরকর্তাস্বরূপে কথা চালাচ্ছে।

যেমন মামুলী কথা হয় এসব সামাজিক মজলিসে, কথাবার্তাটা ঠিক সে ধাঁচের নয়—হঠাৎ শুনে মনে হয় যেন পাট বেচাকেনার চুক্তি হ'চ্ছে। তার কারণ বোধ হয় এই, যে কর্তা স্বয়ং প্রসিদ্ধ পাটব্যবসায়ী 'আর্সন' কোম্পানীর বড়বাবু, সে কোম্পানীর কয়েকটা গুদামে পর পর পাঁচ বচ্ছর আগুন লাগায় তারা ইনসিওরান্স কোম্পানীর প্রচুর টাকা মেরে হঠাৎ ফেঁপে উঠেছে। শ্রীবিলাস এই কোম্পানীর জাঁহাবাজপুর মোকামের সঙ্গে পাটের কারবার করে। কর্তার বড় ছেলে বেচু চৌধুরী সেই জাঁহাবাজপুর মোকামের আফিসার।

শ্রীবিলাস বলছিল, "দশ হাজার টাকা নইলে চলে না। দেখুন, বিয়ে মাত্রই লোকসানি কারবার, তায় আপনাদের মেয়ে নেহাৎ বামুনের গরু হবে না!"

বেচু চৌধুরী বল্লে, "এ বিয়েকে বলছেন লোকসানের কারবার? 'আর্সন' কোম্পানীকে এতে আপনি গেঁথে পাচ্ছেন। এই 'গুডউইল'-এর দামই তো লাখ টাকা।"

শ্রীবিলাস বল্লে, "কিন্তু ভাই নগদ টাকা হাতে না থাকলে সে গুডউইল ভাঙ্গিয়ে ব্যবসার কি হবে? এবার পাটের বাজার যা হয়েছে

তা দেখছো তো। কম সে কম বিশ হাজার টাকা হাতে না নিয়ে তো এবার পাট ছোঁয়াই যাবে না। তার অর্দ্ধেক স্থধু আমি চাইছি। তা যদি পাই তবে আমি রাজী। তাতে যদি লাভ হয়, বিবেচনা কর তোমার বোনইতো বড়লোক হবে!”

কর্তা গম্ভীরভাবে বলিলেন, “আচ্ছা মেয়েটাকে দেখ তো, তারপর সে সব কথা হবে।” ব’লে তিনি উঠে গেলেন।

শ্রীবিলাস তখন বল্‌লে, “ওসব হাঙ্গামা কেন মিছে ক’রছো ভাই। মেয়ের আবার দেখবো কি? সব মেয়েই সমান। দু’দিন চারদিন কেউ ফরসা থাকে, কেউ কালো, কেউ মোটা, কেউ রোগা। তার পর দুবার আঁতুর ঘুরে এলেই সব সমান হ’য়ে যায়। ওর জন্য কোনও চিন্তা নেই, আগে টাকার কথাটা পাকা ক’রে নেও, তার পর বল তো, একবার কেন, লক্ষ বার মেয়ে দেখবো।”

“এর আর কিন্তু নেই! ভাবছো হয়তো, স্থন্দর চটকদার মেয়ে তোমাদের, তাকে দেখিয়ে কাবু ক’রে আমার দর কমিয়ে দেবে। সে হবে না, আমি দেখবোই না যে পর্যন্ত দেনাপাওনার কথা পরিষ্কার না হয়।

কর্তা ব্যবসাদার হ’লেও এতটা ব্যবসাদারি তাঁর বরদাস্ত হ’ল না বোধ হয়। তাই শ্রীবিলাস এর পরও যখন তার দশ হাজার টাকার কথা নিয়ে পীড়াপীড়ি ক’রতে লাগলো তখন কর্তা এসে তাকে জানালেন যে, মেয়ে পাটের গাঁইট নয়।

এই সব কথাবার্তা শুনে বাঁড়ুজ্যের সমস্ত শরীর যেন রাগে ফুলছিল। তারপর কর্তা যখন শক্ত কথা ব’লে শ্রীবিলাসকে তাড়িয়ে দিলেন তখন তার একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছা হচ্ছিল তার নির্গম্যমান পৃষ্ঠের উপর একজোড়া শক্ত ঘুসী ও গণ্ডা চারেক পদাঘাত লাগিয়ে দিতে।

কিন্তু উপযুক্ত সুযোগ ও নির্জনতার অবসরের জন্য সে সম্ভাষণ আপাতত মুলতুবী রেখে বাঁড়ুজ্যে পাশের ঘরে গিয়ে বসলো তার ছাত্রীর প্রতীক্ষায়।

প্রহেলিকা এলো—কিন্তু বই খাতা নিয়ে নয়।

সে বল্‌লে, "আজ পড়তে পারবো না মাষ্টার ম'শাই।"

বাঁড়ুজ্যে ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে বল্‌লে, "কেন আপনি মিছেমিছি ঐ গাড়লটার কথায় এত বিচলিত হচ্ছেন। ওটা একটা পশু—ও কি আপনাকে বিয়ে করবার যোগ্য? ও যে অমনি জানোয়ার হবে তা আমি বরাবরই জানি। আগে নাকি ও বড় ত্যাগধর্মের বুলি কপ্‌চাত, তাই এখন আর পাট আর টাকা ছাড়া মুখে কথা বেরোয় না। খুব হয়েছে—দু'ঘা' জুতো মেরে ওকে বিদায় করলে ঠিক হ'ত।"

প্রহেলিকা বল্‌লে, "আপনি ওর উপর অত রাগ ক'রছেন কেন? খাসা লোক, আমার মনে হয়। একেবারে খাঁটি ইকনমিক ম্যান—ইকনমিক্সের আদর্শ!"

"ইকনমিক্সের এমন অপমান করবেন না। যখন এ শাস্ত্র পড়া হবে তখন দেখবেন যে এতে এমন অমানুষ সৃষ্টি করতে পারে না। শ্রীবিলাস কোনও দিন ইকনমিক্স পড়েনি, এর কোনও ধারই ধারে না সে।"

"আশ্চর্য তো! ইকনমিক্স না পড়েই একেবারে রিকার্ডোর আদর্শ-মানুষ হয়েছেন। মোলেয়ারের যে লোকটি না জেনে চিরজীবন গদ্য ব'লে গেছে জেনে অবাক হ'য়ে গিয়েছিল, তাঁরই মত শ্রীবিলাসবাবু হয়তো একদিন আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে ইকনমিক্স না পড়েও তিনি ঠিক ইকনমিক ম্যান হয়েছেন।"

"যাক গে যাক, ও নিয়ে আপনি নিজেকে উদ্বিগ্ন করবেন না। ও

হতভাগা আপনার স্বামী হওয়া দূরের কথা এক মুহূর্তের ভাবনার যোগ্য নয়!"

এক মুহূর্ত একটু চমকিত দৃষ্টিতে বাঁড়ুজ্যের মুখের দিকে চেয়ে প্রহেলিকা বল্‌লে, "কিন্তু শুনেছি তিনি আমার মত মেয়ের বর হবার সম্পূর্ণ যোগ্য।"

"দেখুন, নিজেকে অতটা অপমান করবেন না আপনি।—"

"অপমান আমি না করলে আর দশজনে করবে। বিয়ে যদি না হয় আমার তবে—"

আবেগভরে বাঁড়ুজ্যে বল্‌লে, "আপনার বিয়ে হবে না! ওই শ্রীবিলাস ছাড়া এমন কে হতভাগ্য আছে যে আপনাকে স্ত্রীরূপে পেলে ধন্য হ'য়ে না যাবে। আপনার মত সুন্দরী—এমন বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী, কলাবতী, সুরসিকা, সুচরিত্রা—"

এই বক্তৃতায় বাধা দিয়ে চিন্তাযুক্তভাবে প্রহেলিকা বল্‌লে, "কিন্তু—কি জানেন? মুস্কিল হয়েছে এই যে আপনি বামুন!"

কলেজে পড়বার সময় বাঁড়ুজ্যে এক প্রফেসারের কাছে পড়তো যিনি আঁক ক'ষতে একসঙ্গে পাঁচ ছয় ধাপ ডিঙ্গিয়ে গিয়ে এক একটা ধাপ বোর্ডে লিখে যেতেন। ছেলেরা তাঁর সেই সমাধান বুঝতে হিমসিম খেয়ে যেতো।

প্রহেলিকার এই উত্তরটায় সে তেমনি যুক্তিশ্রেণীর এক রাশ ধাপ ডিঙ্গিয়ে গিয়ে প্রতিপাদ্যের একেবারে সামনাসামনি হ'য়ে পড়ায় বাঁড়ুজ্যে তেমনি প্রশ্নটায় একটু ভ্যাবচ্যাকা খেয়ে গেল। তারপর সে যখন বুঝতে পারলে কি কথাটা প্রহেলিকা ইঙ্গিত করছে, তখন একদিকে হ'ল তার রোমাঞ্চ, আর একদিকে সে লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলো।

সে বল্‌লে, "মানে—আপনি বলতে চান, ওর নাম কি, বামুন না হ'লে—"

প্রহেলিকা অম্লানবদনে বল্‌লে, "বিয়ে হ'তে কোনও বাধাই থাকতো না।"

এত আনন্দ কি সহ্য হয়? না বিশ্বাস হ'তে চায়। মেদমাংসের বাহুল্য না থাকলে বাঁড়ুজ্যে হয় তো লাফিয়েই উঠতো। কিছুক্ষণ কেবলি লাল হ'য়ে শেষে সে বললে, "সত্যি বলছেন? অসম্ভব!"

"কেন অসম্ভব কিসে? আপনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সুরসিক, সুচরিত্র।"

একটু হেসে বাঁড়ুজ্যে বল্‌লে, "কিন্তু আমার ভ্যালু ইন এক্সচেঞ্জ—"

"আপনিই তো বলেছেন হৃদয়ের টানাটানির ভিতর ডাইনামিক্স বা ইকনমিক্স-এর কোনও সূত্র খাটে না।"

"যাক গে, ওসব আলোচনায় কোনও লাভ নেই।"

"কেন? আপনি কি জাতটাকে একেবারে অত্যজ্য মনে করেন?"

এবার লাফিয়েই উঠলো বাঁড়ুজ্যে। আবেগের সহিত বল্‌লে, "মোটেই নয়। আমার এ বামনাই একটা জীর্ণ খোলস বই তো নয়, ঝেড়ে ফেলতে পারলে বাঁচি।"

একটু হেসে প্রহেলিকা বল্‌লে, "তা হ'লে একদিন আমাকে নিয়ে চলুন না ফার্পোয় ডিনার খেতে।"

"বেশ, কবে যাবেন বলুন।"

"মামা দার্জিলিং যাবেন দশ পোনেরো দিন বাদে, তারপর একদিন। আবার আসছে মাসের পোনেরোই আমার বিয়ে, তার কিছুদিন আগে।"

হঠাৎ স্বর্গ থেকে আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল বাঁড়ুজ্যে। হতাশ স্বরে সে বললে, "বিয়ে ঠিক হ'য়েছে তা হ'লে?"

"হাঁ পোনেরই তারিখ, কেবল—হাঁ ভাল কথা আপনার বন্ধুকে একটা খবর দিতে পারবেন ?"

"কোন বন্ধুকে ? কি খবর ?" খুব নিস্পৃহভাবে বল্‌লে, বাঁড়ুজ্যে।

"এই শ্রীবিলাসবাবুকে। তাকে বলবেন যে ঠিক তিনি যা' চান তেমনি একটি মেয়ে আছে। দশ হাজার টাকা নগদ তারা দিতে প্রস্তুত—তবে মেয়ে দেখাবেন না তাঁরা কিছুতেই। খুব বড়লোকের মেয়ে, দশ হাজার তো হালফিল পাবেনই, তা' ছাড়া অতবড় একটা বড়লোক শ্বশুর, যখন তখন যা' চাইবেন তাই পাবেন।"

"আচ্ছা, দেবো খবর।"

"তাঁদের ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি, সেখানে গেলেই হবে।" ব'লে একখানা কাগজ টেনে নিয়ে প্রহেলিকা ঠিকানাটা লিখে দিলে।

সেটা হাতে ক'রে উঠবার সময় বাঁড়ুজ্যের বিপুল ভুঁড়ি আন্দোলিত ক'রে যে দীর্ঘনিঃশ্বাসটা বেরুল তা' সে গোপন করতে পারলে না।

হেসে প্রহেলিকা বল্‌লে, "ওকি! আপনি অতটা হতাশ হচ্ছেন কেন ? আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে ব'লে ? তার জন্য চিন্তা করবেন না। কার সঙ্গে বিয়ে হবে সেটা এখনো ঠিক হয়নি।—পালাই এখন।" ব'লে সে ছুটে চ'লে গেল।

১১

বাঁড়ুজ্যের খবরটা যদিও শ্রীবিলাস ঠিক বিশ্বাস করলে না তবু ভাবলে নাড়াচাড়া ক'রে দেখলে ক্ষতি কি ? তার দেওয়া ঠিকানায় গিয়ে সে দেখলে যে খবরটা মিথ্যে মোটেই নয়।

এক ঘণ্টার বৈঠকেই সব ঠিক হ'য়ে গেল। পরের মাসের

পোনেরোই তারিখে বিয়ে ঠিক হ'ল। আগাম এক হাজার টাকার চেক পকেটে ক'রে শ্রীবিলাস উঠে গেল।

তার পর থেকেই তার মনটা উস্‌খুস্‌ করতে লাগলো। মেয়েটাকে একবার দেখলে না সে, না জানি কেমন সে মেয়ে?—এ কি বড়লোকী দেমাক বাপু যে বিয়ের মেয়েকে দেখাবে না?

যতই দিন গেল ততই তার অস্বস্তি বেড়েই গেল।

বিয়ের উদ্যোগ সে যথারীতি করতে লাগল, যথাসম্ভব কম খরচে যাতে হয়। খুড়োকে নিয়ে এলো দেশ থেকে।

এমন সময় সে একদিন সকালে একখানা চিঠি পেল, তা' পড়ে সে চমকে গেল।

চিঠি লিখেছে একটি মেয়ে। সে লিখেছে, "নিষ্ঠুর, যদি জানতে চাও যে দশ হাজার টাকার লোভে কি সর্বনাশ তুমি করেছ আমার, তবে কাল এগারটার পর যে কোনও সময়ে লেকের Swimming Poolএ গিয়ে দেখো তোমার কৃতকার্যের ফল।

তখন প্রায় এগারটা। ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে শ্রীবিলাস ছুটে গেল লেকের ধারে। এ কি প্রহেলিকা? কি দেখবে সে? কি দেখাবে তাকে? কে দেখাবে?

ছুটতে ছুটতে লেকের ধারে গিয়ে সে দেখতে পেলে Swimming Pool জনশূন্য, কেবল তার diving boardএর উপর একটি মেয়ে একা দাঁড়িয়ে আছে।

সে কিছু দূরে থাকতেই মেয়েটা হঠাৎ যেন ছিটকে পড়লো জলে!

ছুটে এগিয়ে গেল শ্রীবিলাস, হা-হা করতে করতে।

মেয়েটি যে ডুবলো সে ডুবলোই—আর তার চিহ্নও দেখা যায় না!

আত্মহত্যা করছে নিশ্চয়!

বিবেচনা করবার সময় নেই। তাড়াতাড়ি তার চাদর, কোট, জুতো খুলে ফেলে শ্রীবিলাস ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। সে শিক্ষিত সাঁতারু। বার বার সেখানে ডুবে ডুবে মেয়েটির খোঁজ করতে লাগলো, কোনও চিহ্ন নেই তার! আশ্চর্য! ভারী ভয় হয়ে গেল!

—আজকালকার মেয়েরা কি? কথায় কথায় আত্মহত্যা!

অনেকক্ষণ খুঁজে খুঁজে সে যখন একটু হাঁফ ছাড়বার জন্য থাই জলে এসে দাঁড়িয়েছে তখন সে দেখতে পেলে যে পুকুরটার অপর পারে দাঁড়িয়ে মেয়েটা খিল খিল ক'রে হাসছে।

বুঝতে পারলে সে যে মেয়েটি সন্তরণে বিশেষ পারদর্শিনী। ডুব সাঁতার দিয়ে এতখানি চ'লে গিয়ে সে নিঃশব্দে তীরে উঠে দাঁড়িয়ে রঙ্গ দেখছে। শ্রীবিলাস শুধু মিছিমিছি এই অবেলায় স্নানাহারের পর ঠাণ্ডা জলে খানিকটা চুবুনি খেলো!

কিন্তু রাগ করতে সে ভুলে গেল। মেয়েটির দিকে চাইতেই সে এমন একটা শোভার হিল্লোল তুলে ছুটে গেল যে তার সেই অপূর্ব রূপের দিকে মুগ্ধ নয়নে চেয়ে সে সব ভুলে গেল।

মেয়েটি ছুটতে ছুটতে গিয়ে প্রবেশ করলে পাশের একটা বাড়িতে।

শ্রীবিলাস ভিজে কাপড়েই, জুতো জামা হাতে ক'রে অনেকক্ষণ সেই বাড়ির সামনে টহল দিলে। কেন, তা সে জানে না। তার তৃষিত দৃষ্টি শুধু সেই বাড়ির ইটের দেওয়াল ভেদ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলো।

যখন আর তার দেখা পাবার সম্ভাবনা আছে ব'লে মনে হ'ল না, তখন সে ফিরলে।

বাড়ি ফিরবার পথে চলতে চলতে একখানা মোটর হঠাৎ তার পাশ দিয়ে গেল; তার ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে প্রহেলিকা হেসে বল্‌লে, "কেমন জব্দ!"

মোটর সোঁ সোঁ শব্দে চ'লে গেল।

একখানা মোটর ট্যাক্সি জোগাড় ক'রে শ্রীবিলাস পিছু নিলে।

প্রহেলিকাকে তার বাড়িতে ঢুকতে দেখে সে ফিরলে।

* * * *

দশ হাজার টাকা—ফেলবার জিনিস নয়!

তবু শ্রীবিলাসের মনে হ'তে লাগলো, তুচ্ছ দশ হাজার! লাখ টাকা ও মেয়েটার পায় কেটে দেওয়া যায়।

এমন মেয়ে হাতে পেয়ে সে ছেড়ে দিলে!

আর দুদিন পরে সে স্থির করলে, দূর হোক ছাই যে হাজার টাকা নিয়েছে সে তা' ফিরিয়েই দেবে। একে চাই!

চার দিন পর সে স্থির করলে প্রহেলিকা তাকে জব্দ করেছে। এর ঠিক মুখের মত জবাব হবে যদি সে তাকে বিয়ে করতে পারে।

পাঁচদিনের দিন সঙ্কল্প স্থির ক'রে সে প্রহেলিকার বাড়িতে আবার গেল।

কিন্তু সে বাড়ীর দুয়ারের সামনে দাঁড়াতেই খিল খিল হাসির শব্দ শুনে সে দেখতে পেলে একটা জানালায় দাঁড়িয়ে প্রহেলিকা হাসছে।

সব সাহস তার হঠাৎ উবে গেল। সে পায় পায় স'রে ফিরে এলো।

এর পর একদিন হঠাৎ সে উঠলো গিয়ে 'আর্‌সন' কোম্পানীর আফিসে।

বড়বাবুর কাছে যেতে সাহস হ'ল না। বেচু চৌধুরীকে ডেকে বল্‌লে, "একটা কথা আছে ভাই, আসবে আমার সঙ্গে একবার?"

নিয়ে গেল তাকে একটা হোটেলে চা খাওয়াতে।

কেক স্যাণ্ডউইচ চা উজাড় হ'য়ে গেল—সে কেবল এটা ওটা বাজে কথাই বল্‌লে।

খানসামা বিল নিয়ে এলো, টাকা দিয়ে উঠলে তারা, তার পর দাঁড়িয়ে উঠে খুব খানিকটা ঢোঁক গিলে শ্রীবিলাস বল্‌লে "কথাটা কি জান? এই, তোমরা বোধ হয় খুব রাগ করেছ।"

"না—তেমন কিছু নয়, তবে বাবা একটু—হাঁ চটেছেন বইকি।"

"যাক গে যাক, ওসব কথায় আর কাজ নেই, বলছিলাম কি? বিয়েটা হ'য়েই যাক।"

"মানে, দশ হাজার টাকা চাই তো তোমার?"

"না, না, অত নয়, যা হয় দিও তোমরা, কিন্তু ১৫ই তারিখেই কাজটা সেরে ফেল। আবার ফিরতে হবে আমার।"

"তা বেশ কাল এসো। বাবার সঙ্গে কথা ক'য়ে ঠিক হয় তো, কাল আশীর্বাদ ক'রে যেও।"

"বেশ বেশ! কিন্তু কথাটা কি জান তোমরা হয়তো বুঝতে পার নি। ওর নাম কি, আমাদের নিয়ম আছে শুভদৃষ্টির আগে বরকে ক'নে দেখতে নেই। তাই বলছিলাম। তা' আশীর্বাদ! হাঁ তা হবে, আমার এক খুড়োমশায় এসেছেন, তিনি গিয়ে আশীর্বাদ করবেন।"

"তবে দেনা-পাওনার কথাটা—"

"তোমার বোন, তোমরা যা দেবে দিও।"

খুড়ো ম'শায় পরের দিন আশীর্বাদ ক'রে এসে বল্‌লেন, "খাসা মেয়েটি বাবাজী! পটের পরী।"

"হেঁ হেঁ!" ব'লে শ্রীবিলাস এমন একটা ভঙ্গী করলে যেন সে পটের পরী গড়বার ষোল আনা কৃতিত্বটা তারই।

তারপর, যে মেয়েটির সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল তার বাপের কথা মনে হ'ল।

—এক হাজার টাকা তাকে ফেরত দিতে হয়। করকরে এ-ক হা-জা-র টা-কা!

সে টাকা ফেরৎ দিলেও বাবুরা হয়তো বেশ এক পশলা গালাগালি বর্ষণ করবেন। এক একবার সন্দেহ হ'ল যে, সে নিজে কথাটা ব'লতে গেলে হয় তো পিঠেও দু'চার দশ ঘা প'ড়তে পারে।

যখন সে এমনি দুর্ভাবনায় ব্যাকুল, তখন একদিন তার কাছে এল শশীকান্ত।

শশীকান্ত ইউনিভারসিটির একটা ডাকসাইটে ভাল ছেলে।

শ্রীবিলাস জিগ্‌গেস করলে, "কি করছো ভাই এখন?"

শশী বল্‌লে, "পাঁচ হাজার রূপেয়া দেলায় দে রাম।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ একটা স্কলারশিপ পেয়েছি আমেরিকা যাবার। স্কলারশিপে যে টাকা পাব, তার চেয়ে হাজার চারেক টাকা বেশী খরচ লাগবে। তাই পাঁচ হাজার টাকার জন্যে হন্যে হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। শুনেছিলাম, কলকাতার রাস্তায়, বিশেষ ক্লাইভ ষ্ট্রীট থেকে বড়বাজারের পথে টাকা প'ড়ে থাকে, কুড়িয়ে নিলেই হ'ল। একমাস সেখানে হেঁটে হেঁটে হয়রাণ হ'য়ে গেলাম, কিছুই হ'ল না।"

শ্রীবিলাসের ব্যবসা-বুদ্ধি হঠাৎ চন্‌ চন্‌ হ'য়ে উঠলো। সে বিস্তর সহানুভূতি দেখিয়ে বল্‌লে, "তাইতো, তোমার তাহ'লে টাকাটার বড্ডই দরকার প'ড়ে গেছে দেখছি। তা' দেখ, সম্প্রতি আমি একটা দাঁও মেরেছি। তাই ভাবছি যেখানে thy necessity is greater than mine, সেখানে সেটা না হয় তোমার সঙ্গে ভাগ ক'রেই নেওয়া

যাবে। তুমি পাঁচ হাজার টাকা পেলেই খুসী তো ? বাকী যা পাবে, তা আমায় দেবে ?”

শশী সলম্ফ সম্মতি জানাল।

শ্রীবিলাস তখন বল্‌লে, “কিন্তু সামান্য একটা কাজ করতে হবে—ওর নাম কি—একটা বিয়ে।”

“একটা কেন পাঁচটা করতে রাজী আছি।”

শ্রীবিলাস ফন্দীটা পাকা করতে লাগলো।

চট্‌ ক’রে মেয়ের বাপের কাছে কথাটা পাড়তে সাহস হ’ল না। ঠেলতে ঠেলতে সে কাজটা ১৪ই ফাল্গুনের সন্ধ্যা পর্যন্ত ঠেলে রাখলে সে—

তখনও নিজের যেতে সাহস হ’ল না, পাঠালে তার পিসতুতো ভাই তারিণীকে। তারিণী তাকে অভয় দিয়ে বল্‌লে, কোনও চিন্তা নেই, আমি সব ঠিক ক’রে দেব।

অভয় দিলে বটে, কিন্তু ভয়টা চট্‌ ক’রে কাটলো না শ্রীবিলাসের। ১৫ই তারিখ যখন সে বিয়ে করতে বের হ’ল, তখনও তারিণী কোনও পাকা খবর দিলে না।

১২

সেদিনের পর প্রহেলিকাকে নির্লিপ্তভাবে পড়ান বাঁড়ুজ্যের পক্ষে অসম্ভব হ’য়ে উঠলো।

প্রহেলিকার সান্নিধ্য তার কাছে বরাবরই দারুণ সঙ্কোচ ও হৃৎকম্পের কারণ ছিল, এখন তার দূরশ্রুত পদশব্দও ভূমিকম্পের হেতু হ’য়ে উঠলো।

যতক্ষণ প্রহেলিকার কাছে সে থাকে, ততক্ষণ সে একবার লাল হ'য়ে যায়, একবার একদম ফ্যাকাশে হ'য়ে পড়ে; ক্ষণে ক্ষণে সে ভয়ানক ঘেমে ওঠে! মুখ তুলে আর সে চাইতে পারে না। চায় মুখ নীচু ক'রে আড় চোখে বার বার, আর প্রহেলিকার কৌতুকোজ্জ্বল চোখের সঙ্গে দেখাদেখি হ'লেই অমনি চোখ নামিয়ে প্রচণ্ডবেগে আঁক কষতে আরম্ভ করে—ঘামের নদী বয়ে যায় তার গায়।

কথায় কথায় ভুল করে সে, আঁক বোঝাতে গিয়ে কোনও দিনই ভুল না ক'রে পারে না। আর প্রহেলিকা যেন হঠাৎ আঁকে এত পারদর্শিনী হ'য়ে উঠেছে যে, কোনও একটা ভুল তার চোখ এড়ায় না। বাঁড়ুজ্যে ভুল করলেই খিল খিল ক'রে হেসে সে বলে, "ও কি ক'রলেন মাস্টার মশাই।" বাঁড়ুজ্যে সে হাসিতে আরও এলিয়ে যায়।

প্রহেলিকার মুখে চোখে দুষ্ট হাসি লেগেই থাকে সব সময়, এখন যেন সে হাসি আরও দুষ্ট, চোখ দুটো আরও উজ্জ্বল—কৌতুকে ভরপুর। মাস্টার মশায়ের এ দুর্গতি সে প্রাণ ভ'রে উপভোগ করে।

কিন্তু সেদিনকার সেই খোলাখুলি আলাপের পর প্রহেলিকা আর সে প্রসঙ্গও তোলে না।

মাস কাবার হয়ে গেল। ফারপোর ওখানে যেতে গেলে ইংরেজী পোষাক চাই ব'লে বাঁড়ুজ্যে তার যথাসর্ব্বস্ব খরচ ক'রে একটা স্যুট বানিয়ে ফেললে। কিন্তু ফারপোর ওখানে খেতে যাবার নামও করে না প্রহেলিকা!

বাঁড়ুজ্যে হতাশ হয়ে উঠলো।

একদিন সে নূতন স্যুট প'রে প্রহেলিকাকে পড়াতে এলো। প্রহেলিকা তাকে সেই বেশে দেখে বললে, "বাঃ আপনাকে চমৎকার মানিয়েছে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে আপনাকে!"

একথায় বাঁড়ুজ্যের অন্তর চট্‌পট্‌ আত্মপ্রসাদে বোঝাই হবার পথে থমকে গেল।

কেন না কথাটা বলেই প্রহেলিকা হঠাৎ হেসে যেন গ'লে পড়লো।

বাঁড়ুজ্যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বারবার তার পোষাকের দিকে চাইলে, ভাবলে না জানি কি ঘোরতর ত্রুটি হয়েছে। না হয় তো বুঝি বা তাকে এ পোষাকে ভয়ানক হাস্যাস্পদ দেখাচ্ছে—না হয় তো—দূর ছাই, একখানা আরসী যদি থাকতো!

অনেকক্ষণ চেষ্টায় সে কথঞ্চিৎ আত্মস্থ হয়ে বললে, "তার মানে আমাকে অত্যন্ত বিশ্রী দেখাচ্ছে।"

প্রহেলিকা বললে, "না না, সত্যি আপনাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু ভাবছি, আপনার স্ত্রী ঠিক কি রকম হলে মানাবে। এই যে, এতক্ষণে আপনার আসবার সময় হল?"

শেষ কথাটা ব'লে প্রহেলিকা যাকে সম্ভাষণ করলে তিনি হচ্ছেন সেই বুড়ো ভদ্রলোক যাকে সদাসর্ব্বদাই অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে প্রহেলিকার সঙ্গে দেখা যায়। তাকে দেখে বাঁড়ুজ্যের যা কিছু উৎসাহ অবশিষ্ট ছিল একেবারে নিভে গেল।

সে ভদ্রলোক বললেন, "কেন, আমার তো দেরী হয়নি। ঠিক এই সময়েই তো আমায় আসবার কথা বলেছিলে।"

"বাঃ, বললেন, হ'ল আর কি? এখন মাস্টার ম'শায় এসেছেন, পড়তে হবে না? বলুন তো মাস্টার ম'শায়।"

বাঁড়ুজ্যে বললেন, "তা' আপনার যদি কোনও engagement থাকে, না হয় আমি যাই, রাত্রে আসবো'খন।"

"তার চেয়ে বরং আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে।"

কোথায় যেতে হবে একথা জিজ্ঞাসা করবার ফুরসৎ হল না

বাঁড়ুজ্যের। সে তৎক্ষণাৎ বললে, "আচ্ছা চলুন"—পাছে প্রহেলিকা আবার হঠাৎ মত বদলে ফেলে।

গেল তারা ফারপোর খানা ঘরে—খাওয়া দাওয়া করলে।

প্রহেলিকা সমস্তক্ষণ ফর ফর করে কথা ব'লে গেল—সেই বুড়ো ভদ্রলোকের সঙ্গে।

বাঁড়ুজ্যে ভাবলে, না এলেই ছিল ভাল।

মনটা তার এত বিরক্ত হয়ে গেল যে অনেকবার চেষ্টা করেও সে ওদের কথার ভিতর নিজের একটা কথার অনধিকার প্রবেশ ঘটাতে পারলে না।

আহারান্তে তারা হোটেল থেকে বেরিয়ে এলে প্রহেলিকা সেই বুড়ো ভদ্রলোকের সঙ্গে ট্যাক্সিতে চললো। বাঁড়ুজ্যে মুখখানা হাঁড়িপানা ক'রে বললে, "তা হ'লে আমি আসি। আজ রাত্রে আর পড়াতে যাব না। কি বলেন?"

হঠাৎ বুড়ো ভদ্রলোককে ছেড়ে এসে প্রহেলিকা বাঁড়ুজ্যের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ফিসফিস ক'রে বললে, "তা যান। কিন্তু মনে রাখবেন, ১৫ই তারিখে আপনার বিয়ে।"

বলেই সে ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠলো।

বাঁড়ুজ্যের দ'মে যাওয়া প্রাণটা এতে হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠলো। সে একরকম হাওয়ায় উড়ে চলতে লাগলো—কলকাতার পথে নয়, নন্দন কাননের সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ দিয়ে।

বন্ধুবান্ধব সবাইকে সে ঘুরে জানিয়ে এলো ১৫ই তারিখ তার বিয়ে।

১৩

নিখিলেশ প্রমোদকে এসে বল্‌লে, "বিয়েটা ঠিক ক'রে ফেললাম ভাই—১৫ই ফাল্গুন!"

দোকানে নতুন মাল এসেছে, প্রমোদ সেগুলো গুছিয়ে রাখছিল। কথাটায় সে এমন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো যে তার হাত থেকে গোটা ছয়েক এসেন্সের শিশি মেঝের উপর প'ড়ে চুরমার হ'য়ে গেল।

গোটা ছুই শিশি তখনও হাতে ছিল, সেগুলো নিখিলেশের মাথা লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে ফেলবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা হচ্ছিল।

নিখিলেশ বল্‌লে, "এঃ! ক'রলে কি?" তারপর ঘরটা এসেন্সের গন্ধে ভুর ভুর ক'রতে লাগলো। তাই সে হেসে বল্‌লে, "আমার বিয়ের মঙ্গলেই বোধ হয় তোমার এ স্থরভির অর্ঘ্যদান! কেমন?"

এসেন্সের শিশি ছুটো প্রমোদ আলমারীর ভিতরই তুলে রাখলে। স্থির করলে যে নিখিলেশের মাথায় ছুঁড়ে মারবার জিনিস এসেন্সের শিশি নয়, কড্‌লিভার অয়েল হ'লে চ'লতো।

নিখিলেশ খানিকক্ষণ বক্ বক্ ক'রে নিমন্ত্রণ ক'রে চ'লে গেল। প্রমোদ "হ্যাঁ", "আচ্ছা" ও "বেশ" ছাড়া কোনও কথাই তাকে বল্‌লে না।—কথা বলা যেন হঠাৎ ভুলে গেল।

নিখিলেশ চ'লে গেলে সে ধপ ক'রে ব'সে প'ড়লো। চুলগুলোকে যেন হঠাৎ তার ভয়ানক শত্রু ব'লে মনে হ'ল—ছু'হাতে সেগুলো ধ'রে প্রচণ্ড বেগে টানতে লাগলো। নিরপরাধ চুল মানুষের কাছে চিরদিনই এ অত্যাচারে অভ্যস্ত। কোনও দিন কারও কোনও অনিষ্ট না ক'রেও তারা ক্রোধান্ধ মানুষের কাছে চিরদিনই এ ব্যবহার পায়।

প্রমোদ ভাবলে। কি ভাবলে ছাই তা কি সেই জানে। মনের

এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত কেবলি কতকগুলো বজ্রগর্ভ বিদ্যুৎ প্রচণ্ড বিক্রমে গর্জন ক'রে গেল—স্পষ্ট কোনও কথাই সে ভাবতে পারলে না।

"একটা উড্ পেন্সিল দিন তো।" একটা ছেলে এসে বল্লে।

ভ্রূকুটি ক'রে প্রমোদ বল্লে, "উড্ পেন্সিল! লেখাপড়া ক'রবেন ছেলে! যাঃ লেখাপড়া ক'রতে হবে না।"

"ও কি! দিন না।"

"না দেবো না। যাঃ—নেই।"

"নেই কি? ঐ তো র'য়েছে।"

"র'য়েছে তো রয়েছে—পাবে না যাও।"

একটু নরম স্বরে ছেলেটা বল্লে, "দিন না। এই দেখুন পয়সা নিয়ে এসেছি—ধার চাইবো না।"

ছিনে জোঁকের আওয়াজ!

বিরক্ত হ'য়ে উঠে প্রমোদ এক গোছা পেনসিল নিয়ে তার হাতে গুঁজে আবার ব'সতে গেল।

ছেলেটা ব'ল্লে, "এত চাই নে তো—একটা চাই—এই নিন পয়সা।"

ব'লে সে পয়সা এবং অতিরিক্ত পেন্‌সিলগুলো প্রমোদকে দিতে গেল। সেগুলো তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে প্রমোদ তাকে এমন ধমকে' উঠলো যে ছেলেটা ভয়ে ছুটে পালাল।

অমনি আর একটা লোক এসে ব'ল্লে, "ফাউণ্টেন পেনের কালি।"

প্রমোদ ব'ল্লে, "বার্লি নেই।"

"বার্লি নয় ম'শায় কালি।—ফাউণ্টেন পেনের কালি।" বিরক্ত হ'য়ে উঠে প্রমোদ তাকে একটা ফাউণ্টেন পেন দিলে।

প্রমোদের মনে হ'ল লোকটা নেহাৎ নাছোড়বান্দা—জিনিষ পেয়েও খুসী নয়, বলে কিনা, "কলম চাইনে ম'শায় কালি—"

বিরক্ত হ'য়ে প্রমোদ ব'ল্লে, "বাঃ চাইলেন ফাউণ্টেন পেন, আবার ব'লছেন 'না'।"

"পেন কখন চাইলাম ?"

"আলবৎ চেয়েছেন।"

"মাইরি ? ইয়ার্কী পেয়েছ ?"

"তুমি আর ইয়ার্কির জায়গা পাওনি ? যাও, বেরোও।"

"কী, যতবড় মুখ ততবড় কথা ? আমাকে বল 'বেরোও'। দেখে নেবো তোমায়, ভারী লবাব পুত্তুর এসেছেন ।"

কি দুর্দ্দৈব ! দু'দণ্ড ব'সে তার মনের দুঃখ হজম ক'রবে, তারও অবসর দেবে না এরা ? প্রমোদ ব'ল্লে,

"ঘাঁট হ'য়েছে, লাটসাহেবের সম্বন্ধী—ইচ্ছে না হয় নিও না—বস্ ছুটি।"

জিনিষ সে অবশ্যই নেবে না, কিন্তু তাই ব'লে একটা ছেঁচড়া দোকানদারের বেয়াদবী সে ব্যক্তি নীরবে সহ্য ক'রে যাবে কেন ? লোকটা দোকানে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্ন ও তার উত্তর তীব্র কণ্ঠে নানা অনভিধানিক অলঙ্কার সহযোগে প্রচার ক'রতে লাগলো। এবং এ ব্যাপারের পরিণতি যে বহু শ্রুত ও অশ্রুতপূর্ব্ব কায়িক শাস্তি হ'তে পারে তাও ইঙ্গিত ক'রতে ত্রুটি ক'রলে না।

ভীড় জমে গেল।

তখন প্রমোদ হাত জোড় ক'রে তার কাছে মাপ চাইলে। লোকটি শেষে গর গর ক'রতে ক'রতে বেরিয়ে গেল। ফাউণ্টেন পেনটা—

বোধহয় অনবধানতাবশতঃ—সে যে পকেটে পুরে নিয়ে গেল, প্রমোদ তা' লক্ষ্য ক'রলে না।

ভীড় কেটে গেলে প্রমোদ ক্লান্ত ও শ্রান্ত হ'য়ে যেই ব'সতে যাবে অমনি—

হঠাৎ আকাশ থেকে যেন নেমে এলো—প্রহেলিকা।

অন্ধকার হ'য়ে গেল প্রমোদের চিত্ত তাকে দেখে—তবু উল্লাসে অন্তর নেচে উঠলো।

এসেন্সের ভুর ভুর গন্ধে তার ঘর মাতোয়ারা হ'য়েছিল—এতক্ষণ তা' সে লক্ষ্য করে নি—হঠাৎ তার মনে হ'ল যেন প্রহেলিকার পদস্পর্শে দোকানে ফুটে উঠলো নন্দনের পারিজাত সৌরভ।

"চুলের কাঁটা—ভাল সেলুলয়েডের—দিন তো এক ডজন।"

তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে প্রমোদ হুকুম তামিল ক'রলে।

প্রহেলিকা ব'ল্লে, "চমৎকার গন্ধ তো আপনার ঘরে। নতুন কোনও এসেন্স বেরিয়েছে না কি? দিন তো দেখি।"

দোকানের সবগুলো এসেন্সের শিশি প্রমোদ সারবন্দী ক'রে সাজালে শো কেসের উপর। প্রহেলিকা একটা একটা ক'রে সেগুলো পরীক্ষা ক'রতে লাগলো। হঠাৎ সে হেসে ব'ল্লে,

"আচ্ছা অমিতা যখন প্রদীপের সঙ্গে উড়ছিল তখন সে কি এসেন্স মেখেছিলো বলুন তো?"

"উড়োজাহাজে"র যে অংশ এবারের "বিবিক্তা"য় বেরিয়েছে তাতে প্রমোদ লিখেছিল,

"রোজই প্রদীপ উড়োজাহাজে চড়ে—আকাশের স্তরে স্তরে সে রোজই বেড়িয়ে বেড়ায়। এতে সে আনন্দ পায়, তৃপ্তি পায়। কিন্তু আজ আকাশে হ'ল কি? হঠাৎ কোথাও এর ভিতর সুরভির ফোয়ারা

ছুটে গেছে কি? নইলে বাতাস কেন পাগল হ'য়ে গেল অপূর্ব্ব সুগন্ধে?

—অমিতা আজ এসেছে—তাই কি সারা বিশ্ব আজ তারই মত পাগল হ'য়ে গেছে?"

কম্পিত কণ্ঠে, কিন্তু একটু হেসে সে ব'ল্লে, "সে এসেন্স বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না।"

প্রহেলিকা ব'ল্লে, "কিন্তু আমার মনে হ'চ্ছে যে আপনার ঘরে আমি সেই এসেন্সের গন্ধ পাচ্ছি। আচ্ছা দেখুন, আপনি কখনও উড়ো জাহাজে চ'ড়েছেন?"

বিনীত ভাবে প্রমোদ ব'ল্লে, "অনেক চ'ড়েছি—রোজ চড়ি; আমার পাইলটের লাইসেন্স আছে।"

চক্ষু দুটি বিস্ফারিত ক'রে প্রহেলিকা ব'ল্লে, "তাই না কি? কি আশ্চর্য!—আপনার ভিতর এত আছে, আপনাকে দেখে সে কথা কে ব'লবে?"

উল্লাসে প্রমোদের অন্তর নৃত্য ক'রে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এলো দারুণ অবসাদ।—নিখিলেশ তো ব'লে গেছে যে আশা করবার আর তার কোনও সম্বল নেই।

"আচ্ছা, আপনি আমাকে একদিন উড়োজাহাজে চড়াবেন? নিয়ে যাবেন একদিন?"

প্রমোদ সসঙ্কোচে ব'ল্লে, "আমি এখনো প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাবার লাইসেন্স পাই নি।"

"কবে পাবেন?"

"আর কয়েকদিন পরে পেতে পারি।"

"তখন নিয়ে যাবেন?"

"কিন্তু তখন—মানে—ইয়ে—আপনার—ওর নামকি—শুনছি তো —বিয়ে হ'য়ে যাবে।"

হো হো ক'রে হেসে প্রহেলিকা ব'ললে, "বিয়ে হবে ? বর কোথায় ? —ওসব বাজে কথা রাখুন, আপনার আমাকে নেবার ইচ্ছে নেই, তাই বলুন।"

প্রমোদের মনটা হঠাৎ ভয়ানক হাল্কা হ'য়ে গেল। বুঝলে নিখিলেশের কথাটা একটা বাজে ভাঁওতা। সে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ব'ল্লে, "না, না, তা নয়, আমাকে বিশ্বাস করুন, B class লাইসেন্স পেলেই আমি আপনাকে চড়াব, কথা দিচ্ছি।"

অপরিসীম উল্লাসের সহিত প্রহেলিকা ব'ল্লে, "উঃ—কি মজা হবে তা হ'লে !—চারিদিকে মহাশূন্য, মাঝখানে শুধু আপনি আর আমি !"

শেষ কথাটা প্রেমোদের উড়োজাহাজ থেকে উদ্ধৃত—তাতে নায়িকা অমিতা ব'লছে নায়ক প্রদীপকে, "চারদিকে মহাশূন্য, মাঝখানে স্থধু তুমি আর আমি।"

আনন্দে লজ্জায় প্রমোদ লাল হ'য়ে উঠলো। এর পর কোনও কথা বলবার মত চিত্তের শমতা আসবার আগেই প্রহেলিকা তার কাঁটা ও এসেন্স নিয়ে চ'লে গেল।

প্রহেলিকা যাবার পরও দোকানঘরখানা যে সৌরভে মশগুল হ'য়ে রইলো তুচ্ছ এসেন্সের গন্ধ তা' কিছুতেই নয়। "উড়োজাহাজের" প্রদীপ অমিতার সঙ্গলাভ ক'রে যে অপূর্ব্ব সৌরভের গন্ধ পেয়েছিল সেটা প্রমোদ কল্পনাই ক'রেছিল, আজ সে তা' নিজে অনুভব ক'রে কৃতার্থ হ'ল।

এর পর প্রমোদকে আর ঠেকিয়ে রাখা দায় হ'ল। এর পর সে যে সব স্বপ্নরচনা ক'রতে লাগলো তাতে প্রহেলিকা তার বিবাহিতা পত্নী

হ'য়ে গেছে ব'লে ধ'রেই নিলে। দমদমা গিয়ে এরোপ্লেন চড়ার সময় ও পরিমাণ অনেকটা বাড়িয়ে দিলে, যাতে তাদের ব্যোমবিহার শীঘ্র সম্ভব হ'য়ে উঠে।

এতে তার দোকানটা কিছু বেশীক্ষণ বন্ধ থাকতে লাগলো। একেবারে যে বন্ধ হ'ল না সে শুধু প্রহেলিকার খাতিরে—এর দুয়ার সে খুলতো, স্বধু প্রহেলিকা আবার তার কাছে আসবে ব'লে।

এলো সে, পরের দিন—তার পরের দিন—বার বার—স্পষ্টই বোঝা গেল তুচ্ছ ওজুহাতে। দু'আনার চকলেট কিনতে এসে ঝাড়া আধঘণ্টা সে গল্প ক'রে যায়। আর সে কি গল্প! রক্তে তাতে নাচন ধ'রে যায়—ইচ্ছে হয় সব চুরমার ক'রে উধাও হ'য়ে ছুটে যেতে।

"উড়োজাহাজ" উপলক্ষ্য ক'রেই বেশীর ভাগ কথাবার্তা হয়।

একদিন প্রহেলিকা ব'ল্লে, "আচ্ছা আপনি আমাদের মনের কথা এত জানেন কেমন ক'রে বলুন তো। অমিতার মুখে যে সব কথা বলিয়েছেন আপনি, প'ড়তে প'ড়তে মনে হয় সব আমারই কথা। কি আশ্চর্য!"

প্রমোদ উত্তর দেবে কি? আহ্লাদে তার বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা বিষম লাফালাফি স্বরু ক'রে দিলে।

প্রহেলিকাই তার পর ব'ল্লে, "ভালবাসার এত তত্ত্ব আপনি জানেন! না জানি কত ভালবাসতে আপনি পারেন। প্রাণটা আপনার যেন রসে টস্ টস্ ক'রছে। আপনি যাকে বিয়ে ক'রবেন সে মেয়ের জীবন ধন্য হ'য়ে যাবে।"

দোকানে ব'সে এই কথা! চ'মকে প্রমোদ চারদিকে চাইলে, যদিও দোকানে তখন কেউ ছিল না।

পুলকের বন্যায় ভেসে গেল তার সত্তা। সে আমতা আমতা ক'রে

বল্লে, "সে সৌভাগ্য—মানে ভালবাসবার মত ক'রে ভালবাসবার সৌভাগ্য যে আমার হবে সে আশা ক'রতেও আমার সাহস হয় না। সামান্য দোকানদার যে, তার পক্ষে—"

তার কথা শেষ না হ'তেই প্রহেলিকা ব'ল্লে, "আচ্ছা, আপনি—আপনার মত এমন একটা লোক—হঠাৎ এইখানে এই দোকান খুলতে গেলেন কেন? প্রথম যেদিন আমি আপনার দোকানে এসেছিলাম সেদিন কি ব'লেছিলেন আপনি তা' মনে আছে? ব'লেছিলেন যে আমারই জন্যে এ দোকান আপনি ক'রেছেন। বলেন নি? তাই কি সত্যি?"

সানন্দে প্রমোদ ব'ল্লে, "আমি ইচ্ছে ক'রে বলিনি, আপনাকে দেখে সত্যি কথাটা ঠেলে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। আপনার জন্যেই এ দোকান।"

প্রহেলিকা একবার বাইরের দিকে চেয়ে ব'লে উঠলো, "উঃ! শুনে আমার কি আনন্দ যে হ'চ্ছে কি ব'লবো। আপনার মত লোক আমাকে এত ক'রে বাড়িয়েছেন—আমার গর্বে ফেটে যেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে।"

প্রহেলিকার স্বধু ইচ্ছা হ'ল, কিন্তু প্রমোদের মনে হ'ল সে ফেটেই গেছে। তার অন্তরাত্মা ব'ললে, তার অনন্ত মুহূর্ত্তে এসে প'ড়েছে—তাকে ঠেলা মেরে তার অন্তর যে সব আবেগপূর্ণ কথার ফোয়ারা তৈরী ক'রলে, সে সব মুখ ফুটে বলবার স্বযোগ তার হ'ল না। কেন না সেই অপ্রাসঙ্গিক বুড়ো ভদ্রলোক ঠিক সেই সময়ে দোকানের সামনে এসে হাজির, আর, অমনি "এই যে আপনি এয়েছেন, চলুন," ব'লে প্রহেলিকা ছুটে তাঁর সঙ্গে চ'লে গেল।

প্রমোদ ব'সে ব'সে বুড়োর মস্তক চর্ব্বণ ক'রতে লাগলো।

একটা মহা মুহূর্ত মাঠে মারা গেল। রসটা যখন পুরো জমজমাট, ঠিক সেই সময় কিনা তার মাথায় প'ড়লো লাঠির বাড়ি!

তা হোক। প্রমোদের আর সংশয় রইলো না যে এই নষ্ট মুহূর্ত আবার অচিরে ফিরে আসবে। আর যখন সে আসবে তখন তাকে সম্বর্দ্ধনা ক'রে নেবার আয়োজন সম্পূর্ণ করবার জন্য সে পরদিন প্রত্যূষে দোকান বন্ধ রেখে ছুটে গেল দমদমার এয়ারোড্রোমে। যত শীঘ্র সম্ভব তার B class লাইসেন্স নিতেই হবে।

১৪

মহাযুদ্ধ যদিও প্রায় এক বছর আগে লেগে গেছে, তবু ভারতীয় কর্তাদের কুম্ভকর্ণের ঘুম তখনও ভাল ক'রে ভাঙে নি। তাঁরা কি ভেবেছিলেন তাঁরাই জানেন, হয় তো ভেবেছিলেন যে ইউরোপের রণক্ষেত্রেই তাঁরা তুড়ি মেরে যুদ্ধ জিতে নেবেন, ভারতের সম্বন্ধে কোনও উদ্বেগের দরকার নেই। কিম্বা হয় তো ভেবেছিলেন যে বৃটেনের বিপুল সাম্রাজ্যের এত সম্পদ আছে, যে ভারতের কাছে তার মাইনে করা সৈনিক আর সামান্য কিছু গুলিবারুদ বই আর কিছু চাইবার তাঁদের দরকার হবে না।

ফলকথা, ভারতের বিপুল লোকবল রণসম্ভার ও আয়োজন জোগান দেবার অশেষ ক্ষমতা, সে সব আহরণ করবার কোনও চেষ্টাই তাঁরা করেন নি।

এতদিনে তাঁদের ঘুম ভাঙবার লক্ষণ দেখা যেতে লাগলো। এতদিনে ডাক প'ড়লো ভারতীয়দের সত্যি সত্যি যুদ্ধের আয়োজন করবার।

তাই সেদিন দমদমায় গিয়ে প্রমোদ শুনতে পেলে যে যুদ্ধে বৈমানিক নেবার জন্য ভারতীয়দের তলব হ'য়েছে এবং সামান্য কয়েকজন পাইলটকে শিক্ষা দেবার আয়োজন হ'চ্ছে। প্রমোদের শিক্ষক তাকে জিজ্ঞেস ক'রলেন, "তুমি যাবে ?"

প্রমোদের পায়ের আঙুল থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত উৎসাহে চন্‌চনে হ'য়ে উঠলো, সমস্ত দেহ এবং মনের আধখানা উল্লাসে হুঙ্কার ক'রে উঠলো "যাবো"—কিন্তু মনের আর আধখানা বাধা দিয়ে ব'ল্লে "প্রহেলিকা।"

মাথা চুলকাতে চুলকাতে সে ব'ল্লে, "তাইতো, ভেবে দেখি।"

তার শিক্ষক তাকে উৎসাহিত করবার জন্য যত যা ব'ল্লেন তার কোনও দরকার ছিল না, কেন না তার মনের ভিতর যে উৎসাহ ঠেলা মারছিল তাই যথেষ্ট—কিন্তু পথ আগলে দাঁড়াল—প্রহেলিকা।

দু'দিন আগে হ'লে সে অসংশয়ে নাম লিখিয়ে যেতো—কিন্তু আজ! —আজ যে প্রহেলিকা হাতের গোড়ায় এসে গেছে, স্বধু তাকে কুড়িয়ে তুলতে হবে। তার উড়োজাহাজে চড়বার নিমন্ত্রণ র'য়ে গেছে—এ সব ফেলে আজ কি আর যাওয়া যায়!

সে শুধু ব'ল্লে, "দুদিন ভেবে দেখি।"

তার পর সে শুনতে পেলো যে এখন যুদ্ধার্থী হ'য়ে যারা নাম লেখাবে তাদের শিক্ষা দেবার জন্যই এয়ারোড্রোমে আয়োজন করা হ'য়েছে, তার বাইরে আর কারও শিক্ষা নেবার স্থবিধা হবে না।

তার মানে সে তার শিক্ষা সম্পূর্ণ ক'রে B class লাইসেন্স পাবে না আর! তা হ'লে প্রহেলিকার আবেদন—তার সঙ্গে নিঃসঙ্গ আকাশবিচরণের মনোমদ কল্পনা—সব বাতিল হ'য়ে যায়!

প্রহেলিকার কাছে তবে সে মুখ দেখাবে কেমন ক'রে?

সে ব'ল্লে, "এখন যদি আমি নাম লেখাই তবে আমায় join ক'রতে হবে কবে ?"

শিক্ষক ব'ল্লেন, "তা হ'লে তোমাকে এখনি চ'লে যেতে হবে। এখানে যেটুকু preliminary training দেবার কথা তা তোমার আছে, এখন তোমায় যেতে হবে দেরাতুনে। স্বধু medical examinationটা হ'য়ে গেলেই।"

ঢোঁক গিলে প্রমোদ ব'ল্লে স্বধু "বুঝলাম।"

আর কিছু না ব'লে সে চ'লে এলো।

প্রহেলিকা তার জীবন ধন্য ক'রে দিতে অর্দ্ধপথ কেন, তিন পোয়া পথ এগিয়ে এসেছে, এখন তাকে ফেলে রেখে প্রমোদের পক্ষে ঐ সব উন্মত্ত কল্পনার সেবা একেবারে সম্ভাবনার বাইরে। তবু মনটা তার খুঁৎ খুঁৎ ক'রতে লাগলো স্বধু এই জন্য যে প্রহেলিকাকে নিয়ে বিমান-বিহার আর হবে না!

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে ফিরে এসে দোকান খুলে ব'সলো।

সারাদিন সে ব'সে রইলো প্রহেলিকার প্রতীক্ষায়। কাল যে কথা হ'য়ে গেছে তার পর আজ যে কোনও একটা ছুতো ক'রে সে আসবেই সে বিষয়ে তার কোনও সংশয়ই ছিল না।

কিন্তু এলো না সে।

আর, সন্ধ্যের পর যখন সে মুখখানা হাঁড়িপানা ক'রে ভাবছে তার শুভ আরম্ভের সুমধুর উদ্বোধনের মুখে বিঘ্নের কথা, তখন সারা মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত ক'রে এলো—বাঁড়ুজ্যে।

ইংরাজী পোষাক পরা বাঁড়ুজ্যেকে দেখে প্রহেলিকার মত প্রমোদেরও পেলো হাসি। সে ব'ল্লে, "এ কি সঙ্ সেজেছ!"

বাঁড়ুজ্যে হেসে ব'ল্লে, "সঙ্ বল, বাঁদর বল, ভালুক বল, কুছ পরোয়া নেই! বাজী মার দিয়া!"

"মানে?"

"মানে আমার বিয়ে—১৫ই ফাল্গুন।"

"১৫ই ফাল্গুন! সেদিন বিয়ের একটা মহামারী লাগবে দেখছি। নিখিলেশও তো ব'ল্লে ১৫ই ফাল্গুন তার বিয়ে।"

"নিখিলেশ কেন বিশ্বের সবার সেদিন বিয়ে হোক—কোনও আপত্তি নেই, মোদ্দা আমার বিয়ে।"

"কোথায়? কার সঙ্গে?"

"সে সব কথা জানতে পারবে বিয়ের সময়। মোদ্দা ১৫ই ফাল্গুন সন্ধ্যে বেলায় আমার মেসে এসে বরযাত্র যাবে এই নিমন্ত্রণ রইলো—পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম না, ত্রুটি অমার্জ্জনীয়। কথাটা ভাই গোপন রেখো। অসবর্ণ বিয়ে, বেশী জানাজানি ক'রতে চাই নে।"

"অসবর্ণ বিয়ে? হঠাৎ?"

"সে ভাই অনেক কথা, ১৫ই ফাল্গুনের আগে বলবার জো নেই, এখন আসি।"

বাঁড়ুজ্যের বিয়ের রহস্য প্রমোদের চিত্তকে বেশীক্ষণ অধিকার ক'রে থাকতে পারলে না, সে স'রে যেতেই প্রহেলিকা আবার তার সমস্ত মন জুড়ে ব'সে গেল।

মনেই ব'সলো—দোকানে এলো না।

শেষে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে প্রমোদ দোকান বন্ধ ক'রে চ'লে গেল।

পরের দিন ভোর বেলায় দোকান খুলতেই তার কাছে এলো চৌধুরী বাড়ীর সরকার।

সরকার একখানা চিঠির কাগজের নমুনা প্রমোদকে দেখিয়ে ব'ল্লে

"এমনি এক গ্রোস চিঠির কাগজ আর খাম আজই আনিয়ে দেবেন।"

প্রমোদ ব'ল্লে, "কাল হ'লে হবে না।"

"না ম'শায় বেজায় তাড়া। বাবুর মেয়ের বিয়ে এই ১৫ই ফাল্গুন, সময় মোটে নেই। আজই ছাপতে হবে চিঠি।"

প্রমোদ অনুভব ক'রলে বাড়ীখানা তার মাথার উপর ভেঙ্গে প'ড়েছে, পৃথিবীর আলো সব নিভে গিয়েছে, বিশ্বব্যাপী অন্ধকারের মাঝখানে তার মাথার ভিতর কে যেন অবিশ্রাম তুবড়ী, হাউই, দোবোমা ও তারা বাজী ছোটাচ্ছে।

যখন হুঁস হ'ল তার তখন সে দেখলে পৃথিবী ঠিক বাহাল তবিয়তে আছে, বাড়ীখানাও নির্লজ্জভাবে অটুট হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সরকার।

সে ব'ল্লে, "আজ পারবো না।"

সরকার ব'ল্লে, "তবেই তো আমাকে রাধাবাজার ছুট করালেন দেখছি।" সে চ'লে গেল।

দুইয়ে দুইয়ে চার হয়, এটা যেমন সাধারণ যোগ ক'রে বলা যায় তেমনি আজকের এই খবর আর কালকের বাঁড়ুজ্যের অসবর্ণ বিয়ের খবর যোগ ক'রে প্রমোদের ঠিক ক'রতে কষ্ট হ'ল না যে ঐ মাংসপিণ্ড বাঁড়ুজ্যেটা এরই মধ্যে বাগিয়ে তাড়াহুড়ো ক'রে প্রহেলিকাকে বিয়ে ক'রতে ব'সেছে—জাত খুইয়েও।

অথচ এই দুদিন আগে প্রহেলিকা এটা ওটা তুচ্ছ জিনিষ কেনবার ছলে তার দোকানে এসে তার সঙ্গে প্রায় সম্পূর্ণ নিরাবরণ প্রেমসম্ভাষণ ক'রে গেছে।

কি কপটী এই নারী!

কি ছুঁচো এই বাঁড়ুজ্যেটা !

রাগটা যেন প্রহেলিকার উপরই বেশী হ'ল। চ'টে ম'টে সে দোকান বন্ধ ক'রে বেরিয়ে গেল।

১৫

প্রহেলিকা একখানা দৈনিক পত্রে একটা গল্প পড়ছিল। তার দুচোখ বয়ে জলের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছিল। শেষ হ'লে বইখানা বন্ধ ক'রে চোখ মুছে সে তার দিদিকে বললে, "মা গো, এত মিছেমিছি কাঁদাতে পারে লোকটা। অথচ লোকটা দেখতে এমন ঠাণ্ডা সুস্থির— কে বলবে যে সে এত বড় খুনে।"

মঞ্জুলিকা বল্‌লে, "কার কথা বলছিস ?"

"আরে এই প্রমোদ ঘোষ—গল্প লিখেছে দেখনা; কাঁদতে কাঁদতে আমার চোখ ফুলে উঠেছে।"

"ও, ওই 'নিঃশেষ' গল্পটার কথা বলছিস, সত্যি ভাই, ভারী চমৎকার।"

"চমৎকার না হাতী। কি অধিকার আছে ওর আমার এতগুলো চোখের জল বাজে খরচ করবার ? রসো ওকে শিক্ষা দিচ্ছি।"

"শিক্ষা দিবি কি রে ? ওকে পাবি কোথায় ?"

প্রহেলিকা তার বাঁ হাতের পাতাটা পেতে আস্তে আস্তে মুষ্টিবদ্ধ করতে করতে হেসে বল্‌লে, "এই আমার মুঠোর ভিতর।"

"মানে ?"

"মানে বলবো, আগে জব্দ ক'রে নিই।"

সে উঠে তার চুলটা বেশ ক'রে গুছিয়ে নিলে, শাড়িখানা বদলে,

আধ ঘণ্টা আরসীর সামনে দাঁড়িয়ে তাকে বাগিয়ে পরলে। তারপর স্নো, পাউডার ঘ'সে কুঙ্কুমের টিপ প'রে মুচকি হেসে আরসীতে তার মুখ দেখে নিয়ে বের হ'ল।"

রূপের তরঙ্গ তুলে ছুটতে ছুটতে সে ঢুকলো গিয়ে প্রমোদের দোকানে।

অন্য একটা লোক দোকানে ব'সেছিল, সে ত্রস্তে ব্যস্তে বল্‌লে, "বসুন, কি চাই?"

লোকটার উপর প্রহেলিকা অযথা চ'টে উঠলো, সে বল্‌লে, "আপনি —আপনি কে?"

লোকটা বল্‌লে, "আমারই এ দোকান।"

"বা-রে! প্রমোদবাবুর দোকান এটা।"

"আজ্ঞে হাঁ, তারই ছিল, এখন আমি কিনেছি।"

"কবে কিনেছেন?"

"দিন আষ্টেক।"

"তিনি আর আসেন না?"

"আজ্ঞে না।"

"কোথায় থাকেন তিনি।"

"তিনি এখন বোধ হয় গেছেন ট্রেনিংএ।"

—"ট্রেনিংএ, কিসের ট্রেনিং?"

"তিনি যুদ্ধে যাচ্ছেন।"

"কি বলছেন আপনি?" প্রহেলিকা তীব্রকণ্ঠে তাকে ধমকে উঠলো, যেন সমস্ত অপরাধ ঐ লোকটারই। সেই যেন চক্রান্ত ক'রে প্রমোদকে যুদ্ধে পাঠিয়েছে।

লোকটি বল্‌লে, "আজ্ঞে হাঁ। তা' তাঁর কাছে কোনও দরকার ছিল কি আপনার? থাকে তো বলুন, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রবো—"

"ছাই করবেন!" ব'লে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো প্রহেলিকা। তার পরে সে সামলে নিয়ে বল্‌লে "বেশ ভদ্রলোক তো, আমার পাওনা শোধ না ক'রে একেবারে চম্পট!"

বলতে বলতে সে বেরিয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে সে পড়বার ঘরে একলা ব'সে প্রমোদের লেখা সেই 'নিঃশেষ' গল্পটা আবার প'ড়তে লাগলো। ঝর্ ঝর্ ক'রে তার দুচোখ বেয়ে জল পড়তে লাগলো।

বই বগলে ক'রে এমন সময় তার কাছে এলো ইলা ভট্টাচার্য্য। ইলা তার সমপাঠি, সেও ইকনমিক্স ও অঙ্কশাস্ত্র নিয়েছে। ফারপোর বাড়ির ডিনারের পর থেকেই সে আসে প্রহেলিকার সঙ্গে বাঁড়ুজ্যের কাছে পড়তে।

এখানে সংক্ষেপে ব'লে রাখা যাক যে ইলাও সুন্দরী—কিন্তু তার বেশভূষায় পারিপাট্য থাকলেও চটক নেই।

প্রহেলিকাকে কাঁদতে দেখে ইলা ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে, "ও কি ভাই? কি হয়েছে?"

হাতের কাগজখানা ইলার সামনে ধ'রে প্রহেলিকা বল্‌লে, "প'ড়ে দেখ্।"

ইলা গল্পটা দেখে বল্‌লে, "ও। 'নিঃশেষ' ওটা পড়েছি ভাই। খাসা গল্প, ভারী ট্র্যাজিক। কিন্তু অবাক করলি তুই প্রহেলিকা। তুই এত সেন্টিমেণ্টাল! তুই না আমাদের সেন্টিমেণ্টাল ব'লে দিনরাত ঠাট্টা করিস!"

"বেশ করি। তোরা যে ন্যাকা, তা ঠাট্টা করবো না! কিন্তু এ

গল্পটা কি ভয়ানক!" ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে, "এমন ক'রেই নিঃশেষ হ'য়ে গেল চারুব্রত!"

"আমার ভাই ভারী রাগ হয় সুচরিতার উপর। কি নিষ্ঠুর মেয়েটা! আমার কি মনে হয় জানিস, আমাদের জাতটাই নিষ্ঠুর। বেচারা পুরুষেরা বোকার মত আমাদের ভালবেসে ফেলে ব'লে আমরা তাদের কি নাকালটা না করি!"

কিছুক্ষণ খুব গম্ভীর হ'য়ে থেকে প্রহেলিকা বল্‌লে, "পুরুষেরাও কম নিষ্ঠুর হ'তে জানে না।" ব'লে সে ফস্‌ ক'রে মুখ ফিরিয়ে নিলে, চোখ যে জলে ছাপিয়ে উঠলো তাই লুকোবার জন্যে।

বাঁড়ুজ্যে এসে পড়লো।

তারও মুখখানা যেন প্রকাণ্ড একটা কেলে হাঁড়ির মত হ'য়ে গেছে, সে ব'য়ে এনেছে যেন রাজ্যের সমস্যা তার বুকের ভিতর।

ইলাকে দেখে তার মুখ আরও কালো হ'য়ে গেল। প্রথম যেদিন ইলা এলো সেই দিন থেকেই বাঁড়ুজ্যে চ'টে আছে। সেদিন প্রহেলিকা বলেছিল, "মাষ্টার ম'শায়, এ ইলা, আজ থেকে আমার সঙ্গে আপনার কাছে পড়বে—" তারপর বাঁড়ুজ্যের কানে কানে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে—"আর পোনেরো টাকা বেশী পাবেন আপনি।"

বাঁড়ুজ্যে তার আর্থিক মানের এ বৃদ্ধিতে খুসী হবে কি, তাতে মনে মনে চ'টেই গিয়েছিল। এখন—এই আসন্ন শুভ মিলনের প্রাক্কালে তাদের পরস্পরের নির্জন সান্নিধ্য-সম্ভোগের পথে এই মূর্তিমতী বিঘ্নটিকে সে মোটেই স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে পারে নি, আজও পারলে না।

সে চুপচাপ পড়িয়ে গেল। ইলা মেয়েটা এমন তীব্র মনোযোগ দিয়ে পড়ে, কোনও কথা বোঝালে এমন চট্‌পট বুঝে ফেলে আর এমন বুদ্ধিমতী শিক্ষাগ্রহী ছাত্রীর মত শান্তভাবে প্রশ্ন করে সব, যে বাঁড়ুজ্যে

তার উপর চ'টেই যায়। তার মনে হয় যে মেয়েটা যেন ভারী হিংস্থটে—সে যে প্রহেলিকার চেয়ে ভাল মেয়ে, কোনও ছ্যাবলামি নেই তার, এইটা জাহির করবার জন্যই যেন সে উঠে পড়ে লেগেছে। তার সামনে প'ড়ে প্রহেলিকাও যেন হঠাৎ নিভে গেল। ছ্যাবলামি করা দূরের কথা সে কথাই কয় না—একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না। যখন বাঁড়ুজ্যে খুব আগ্রহ ক'রে কোনও কথা বোঝাতে যাচ্ছে, প্রহেলিকা তখন খুব সুস্পষ্টভাবে অন্যমনস্ক থেকেও সমানে ঘাড় নেড়ে যায়—যেন কতই সে বুঝেছে! ভারী বিরক্ত লাগলো বাঁড়ুজ্যের!

সেদিন বাঁড়ুজ্যের টাকার মূল্যতত্ত্ব বোঝাবার কথা। সেইজন্য সে আজ পাঁচ দিন ধ'রে রাজ্যের বই ও প্রবন্ধ প'ড়ে এসেছে, দু'দিন নিখিলেশের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা ক'রে এসেছে। স্থির ক'রে এসেছে যে, আজকের এই আলোচনায় সে প্রহেলিকাকে একেবারে তাক লাগিয়ে দেবে।

মোটামুটিভাবে তথ্যটা ব'লে নিয়ে একটা equation লিখে সে যেই সেটা ব্যাখ্যা করতে যাবে, ইলা অমনি চট ক'রে ব'লে বসলো, "ও! এতো quantity theory!" ব'লে সে অম্লানবদনে দু চার ছত্র সাদা বাঙলায় থিওরীটাকে ব্যাখ্যা ক'রে বল্‌লে, "এই তো?"

তাই তো বটে—কিন্তু এ সব কথা এ মেয়েটার এত জানবার কি দরকার ছিল? এখন বাঁড়ুজ্যে করে কি? সে ইলার উপর রীতিমত চ'টে গেল। বল্‌লে, "হাঁ এই বটে, কিন্তু আপনি বুঝেছেন জিনিসটা?"

ব'লে ব্যগ্র প্রতীক্ষায় প্রহেলিকার যে উত্তরে সে অভ্যস্ত, সেই "কিচ্ছু না" কথা দুটো শোনবার জন্য উৎকর্ণ হ'য়ে রইলো।

কিন্তু প্রহেলিকা সুধু ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "হুঁ"—এমন মৃদুস্বরে বল্‌লে যে কথাটা শোনাই যায় না।

—অথচ স্পষ্টই বোঝা গেল যে, বোঝা দূরে থাক, প্রহেলিকা এসব কথার এক বর্ণও শোনে নি।

এ রকম ক'রে পড়াতে বাঁড়ুজ্যে অভ্যস্ত নয়। এমন ক'রে পড়াতে সে আসে নি। মনে মনে ভারী চ'টে সে বহু কষ্টে তার নির্দিষ্ট সময় যো সো ক'রে কাটিয়ে দিলে।

তারপর বই খাতা বন্ধ ক'রে সে আশা করতে লাগলো যে, ইলা এখনি চ'লে যাবে। কিন্তু সে গেল না।

শেষে ইলার সামনেই সে বল্‌লে, "দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার খুব দরকারী কয়েকটা কথা আছে।"

প্রহেলিকা যেন ঘুম থেকে উঠলো। সে বল্‌লে, "আচ্ছা, সে হবে এখন একদিন।"

"কবে আপনার শোনবার অবসর হবে?"

"পোনেরই ফাল্গুনের পর—"

একটু হেসে বাঁড়ুজ্যে বল্‌লে, "মানে ফাঁসিতে ঝোলবার পর আপীল শুনানী!—না, না, তখন হয় তো সে কথার কোনও সার্থকতা থাকবে না।"

"তবে সে অনর্থক কথা নিয়ে সময় নষ্ট ক'রে কিই বা হবে?"

"না, না, সে হবে না, তার আগেই কথা ক'টা বলা দরকার।"

"কিন্তু, আমার দরকার নেই—আর ১৫ই ফাল্গুনের আগে স্থবিধেও হবে না আমার—মাত্র এই দিন ক'টা বই তো নয়।"

ইলা এই কথার মাঝখানে একবার উঠেছিল যাবার জন্যে, প্রহেলিকা গোপনে তার হাতে চাপ দিয়ে তাকে টেনে বসালে।

হতাশ হ'য়ে বাঁড়ুজ্যে বল্‌লে, "তবে আজ থাক, আর একদিন ব'লবো।"

সে উঠলো। প্রহেলিকা হঠাৎ বল্‌লে, "দেখুন আপনার বন্ধু প্রমোদ ঘোষকে আমার গোটাকয়েক কথা বলবার আছে। শুনতে পেলাম তিনি তাঁর দোকান ছেড়ে পালিয়েছেন। তাঁকে একবার পাঠিয়ে দিতে পারেন আমার কাছে?"

বাঁড়ুজ্যে বল্‌লে, "প্রমোদ! শুনছিলাম সে নাকি যুদ্ধে গেছে।"

"গেছে!" এমনভাবে প্রহেলিকা কথাটা বল্‌লে, যে ঠিক একটা আর্তনাদের মত শোনালো।

বাঁড়ুজ্যে বল্‌লে, "ঠিক গেছে কিনা এখনো বলতে পারি না। শুনেছি, পরশু তার medical examination ছিল। সে পরীক্ষায় পাশ হলেই তার join ক'রবার কথা।"

"একটু খোঁজ ক'রে খবরটা জানাবেন দয়া ক'রে—আর যদি তিনি থাকেন, তবে একবার দেখা ক'রতে বলবেন।"

এ কথাও বাঁড়ুজ্যের ভাল লাগলো না। সে স্বধু ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "আচ্ছা।"

কি জানি কেন, সে প্রাণপণ আকাঙ্ক্ষা ক'রতে লাগলো, যেন সে খবর পায় যে, সত্যি সত্যিই প্রমোদ চ'লে গিয়েছে।

তার সঙ্গে প্রহেলিকার কথা বলবার ফুরসুৎ নেই—অথচ প্রমোদের সঙ্গে কথা বলা তার চাই-ই—কথাটা মোটেই স্থবিধের নয়—বিশেষ ১৫ই ফাল্গুন যেখানে আসন্ন।

১৬

পরের দিন বাঁড়ুজ্যে যখন পড়াতে এলো তখনও ইলা হাজির! বাঁড়ুজ্যে ভাবলে, এত ইনফ্লুয়েঞ্জা হ'চ্ছে কলকাতায় এ মেয়েটার কেন হয় না। গোটা কয়েকদিন মাত্র—এই ১৫ই ফাল্গুন পর্যন্ত! কিন্তু

প্রহেলিকা

ইলাকে এমন দুরন্ত রকম সুস্থ দেখাল যে, বাঁড়ুজ্যে তার দিকে চেয়ে মোটেই ভরসা পেলে না।

বরং প্রহেলিকারই আসতে একটু দেরী হ'ল। দণ্ড দুই একা ইলার সঙ্গেই বাঁড়ুজ্যের কথা কইতে হ'ল!

এ কেমন ধারা ঢং বাপু, ভাবলে বাঁড়ুজ্যে। ১৫ই ফাল্গুন বিয়ে যখন ঠিক, তখন তার আগে নির্জনে দুটো কথা কইতে প্রহেলিকার এত ধোকা কেন? অবিশ্যি প্রহেলিকা বলেছে কথাটা গোপন রাখতে, বলেছে তার নাম যেন কিছুতেই প্রকাশ না হয়। যেকালে বাপ মাকে না জানিয়ে বিয়ে হচ্ছে তাতে একথা সে বলতে পারে। তাই ব'লে পড়াশুনার অবসরে সুযোগ ক'রে দুটো কথা বলা, তাতেও এত ভয় কিসের?

প্রহেলিকা এসেই ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বল্‌লে, "বেশ, মাষ্টার মশায়, ইলার সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছেন যে?"

শোন কথা! প্রহেলিকা নিজেই গাফিলি ক'রে—করলে দেরী, আবার সে দেয় এই উল্টো চাপ!

অন্যায়, ভারী অন্যায়, আর মিথ্যে তো বটেই। কিন্তু এমন প্রশান্ত নিশ্চয়তা ও সুস্পষ্ট ঈর্ষার সঙ্গে প্রহেলিকা কথাটা বল্‌লে, যে নির্দোষ হ'য়েও বাঁড়ুজ্যে একটু ভড়কে গিয়ে আমতা আমতা করতে লাগলো। আর ইলা তো লজ্জায় রাঙা হ'য়ে হাসতে লাগলো।

প্রহেলিকা তাদের এই ভাব দেখে চোখ দুটো টান ক'রে ঠোঁটটা বেঁকিয়ে এমন একটা ভঙ্গী করলে যে তাতে বাঁড়ুজ্যে বিশ্রীরকম মুষড়ে গেল। বাঁড়ুজ্যে বল্‌লে, "দেখুন দোষ আপনার—আমাদের—"

গম্ভীরভাবে প্রহেলিকা তেমনি চোখ টান করেই বল্‌লে, "দোষ তো অবিশ্যি আমারই, চিরদিনই এমনি হ'য়ে থাকে, হবেও বরাবরই। যাক,

দেখুন quantity theoryটা আমি কিচ্ছু বুঝিনি, ওটা আজ ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিন।"

বই খুলে গম্ভীরভাবে এমন ক'রেই কথাটা বল্‌লে, যে এ সম্বন্ধে আর দ্বিতীয় বাক্যের অবসর আছে ব'লে বাঁড়ুজ্যের মনে হ'ল না। কাজেই সে quantity theory বোঝাতে লাগলো।

গলদঘর্ম হ'য়ে গেল সে। আজকে যেন সব কথা তার মনের ভিতর তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। ভুলের পর ভুল হ'চ্ছিল আর ইলা অনবরত সংশোধন করছিল। কোনও রকমে সে যখন দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা আঁক ক'ষে জিনিসটা মোটামুটি রকম বুঝিয়ে দিলে, তখন হঠাৎ প্রহেলিকা বল্‌লে, "কিন্তু চেক—চেকগুলো এ হিসাবের কোনখানে গেল। টাকার চলতির হিসাব করছেন কিন্তু চেক বা হুণ্ডী দিয়ে ব্যাঙ্কের মারফৎ যে লেন দেন হয় তার কি কারেন্সীর ভ্যালুর উপর কোনও প্রভাব নেই?"

"অবশ্য আছে," ব'লে বাঁড়ুজ্যে বোঝাতে গেল, কিন্তু তক্ষণি প্রহেলিকা আবার প্রশ্ন ক'রে বসলো, "তা'ছাড়া গভর্নমেণ্টের ক্রেডিট যদি না থাকে, সোনার রিজার্ভ যদি না থাকে। আবার ধরুণ স্টার্লিং বা ডলার, যা সমস্ত পৃথিবীতে চলে। এসব বিষয়ের হিসাব কি রকম হবে?"

হাবুডুবু খেয়ে গেল বাঁড়ুজ্যে। ধীর স্থির হ'য়ে সে যদি ভাবতে পারতো তবে ক্রমে সে এসব সমস্যার সমাধান ক'রে দিতে পারতো হয়তো। কিন্তু একে তার মানসিক শমতা সে সংগ্রহ ক'রে উঠতে পারলে না কিছুতেই, তাতে প্রহেলিকা প্রশ্নের পর প্রশ্ন মেশিন গানের গোলার মত দ্রুতবেগে ছেড়ে তাকে এমন বিব্রত ক'রে দিলে যে বাঁড়ুজ্যে থই পেলো না।

ইলা তখন তার সাহায্য করতে এলো। দুটো একটা টাট্টি ডিঙিয়ে দিলে বলতে গেলে ইলাই! কিন্তু তাতে প্রহেলিকা এমন সাসূয় দৃষ্টিতে ইলার দিকে চাইলে আর এমন ভঙ্গী করলে যেন সে বলছে, "ঈস্ বড় যে দরদ।" তার সে দৃষ্টি আর ভঙ্গী দেখে বাঁড়ুজ্যে আরও হকচকিয়ে গেল।

সেদিনকার পড়ার মজলিসে বাঁড়ুজ্যে সুবিধা করতে পারলে না। সে একটু তাড়াতাড়িই উঠে গেল।

যাবার সময় প্রহেলিকা বল্‌লে, "প্রমোদবাবুর খোঁজ নিয়েছিলেন।"

বাঁড়ুজ্যে বল্‌লে, "হাঁ মানে, সে বোধ হয়, ওর নাম কি গেছে—তার মেডিক্যাল এগজামিনেশন—"

প্রহেলিকা বল্‌লে, "তার মানে তার খোঁজ নেন নি আপনি, কেবল আমাকে ভাঁড়াচ্ছেন।"

এত সুস্পষ্ট সত্য কথার জবাবে আর বলবার মত কথা পেলে না বাঁড়ুজ্যে। সে সোজা চম্পট দিলে।

ইলা বল্‌লে, "ধন্যি মেয়ে তুই পলি, পুরুষ মানুষদের এমন বাঁদর নাচ করাতে পারিস!"

"সে আমার গুণে নয়, ওদেরই গুণে। আমি যতই নেড়ে চেড়ে দেখছি ততই মনে হ'চ্ছে পুরুষ মানুষ মাত্রই প্রচ্ছন্ন বাঁদর। দড়ি ধ'রে বাগ মত টান দিতে পারলেই আপনি নেচে ওঠে।"

"না ভাই, কিন্তু মাষ্টার মশায় বেচারা ভালমানুষ তাকে এমন ক'রে ক্ষেপাতে আছে! বেচারা একেবারে এলিয়ে গেল, আমার ভারী মায়া হচ্ছিল।

"সেই কথাই তো আমি বলছিলাম।"

"হাঁ কিন্তু আমার সামনে অমনি ক'রে—"

"তবে কি করবো? ঢাক ঢাক গুড় গুড়ের মেয়ে আমি নই।"

"ওসব কথা রাখ। তোর কোনও কথার সোজা মানে ধ'রে নেওয়া অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি আমি। তোর মতলবখানা এখনও ঠিক বুঝতে পারছি নে।"

"মতলব যদি কিছু থেকেই থাকে তবে অমনি অমনি তোকে ব'লে দেবো এমন ছ্যাবলা পেয়েছিস আমায়?"

আর একটি মেয়ে এসে পড়লো। মেয়েটির নাম অশোকা। এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'য়েছিল লেকের ধারে যেদিন নিখিলেশের সঙ্গে প্রহেলিকার কথা হয়।

অশোকা এসেই বল্‌লে, "পোড়ারমুখী, এ করছিস কি?"

প্রহেলিকা তাড়াতাড়ি বল্‌লে, "চুপ! চুপ!—ষট্ কর্ণে মন্ত্রভেদ।"

"ষট্‌কর্ণ কোথায়? আমরা তো তিন জন।"

"কেন? আমাদের বুঝি একটা ক'রে কান?"

অশোকা বল্‌লে, "আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে ভাই। ধন্যি সাহস তোর—পারবি সামলাতে সব।"

"দ্রৌপদীর আশীর্বাদে—পারবো। তুই কোনও ভয় পাস নে।—ইলা বাঁদর নাচানটা একটু শিখে নিস আমার কাছে, কাজে লাগবে।"

ইলা বললে, "না ভাই, বড় ধাঁধা লাগছে আমার। আমাকে বল তুই—"

"চুপ।" ব'লে প্রহেলিকা দেখিয়ে দিলে সেই বুড়ো ভদ্রলোককে যিনি আমাদের কাছে ইতিমধ্যে প্রসিদ্ধ হ'য়ে উঠেছেন নিশ্চয়।

তাঁকে দেখে ইলা অশোকা উঠে গেল। প্রহেলিকা তাঁকে সম্ভাষণ ক'রে বললে, "আসুন বিদূষক সাহেব।"

সে ভদ্রলোক বললেন, "জান Riddle, আমার মনে হ'চ্ছে যে

বিদূষক নামটা আমার ঠিক মানাচ্ছে না। অবশ্য বিদূষক প্রণয় সহায়ক, কিন্তু সংস্কৃত নাটকে কোথাও কোনও বিদূষক এক নারীর সঙ্গে গণ্ডা-খানেক প্রণয়ীর মিলনে সহায়তা করেছেন এরকম দেখা যায় কি?"

"কেন শ্রীকৃষ্ণ?"

"শ্রীকৃষ্ণ—তিনি আবার বিদূষক হলেন কবে?"

"দ্রৌপদী স্বয়ম্বর নামক অলিখিত নাটকে। মহাভারতে তার স্পষ্ট পরিচয় আছে। দ্রৌপদীকে পাঁচ পাণ্ডবের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য তিনি যে উপন্যাস রচনা করেছিলেন মালবিকাগ্নিমিত্রের বিদূষকের সর্প দংশনের ভাণ তো তার কাছে ছেলেখেলা।"

"বটে? নজীর আছে তা' হ'লে। তা বেশ, বিদূষকই সই।"

ব'লে বিদূষক ম'শায় একটা চেয়ারে বসতে যেতেই প্রহেলিকা উঠে বললে, "এইবারে চলুন।"

চেপে ব'সে বিদূষক বললেন, "কোথায়?"

অম্লানবদনে প্রহেলিকা বললে, "যেখানে আমি নিয়ে যাব।"

ঘাড় নেড়ে বিদূষক বললেন, "না, তাতে আমার আপত্তি আছে।"

"কেন?"

"প্রথমত আমি ক্লান্ত, আমার বিশ্রাম ও এক পেয়ালা চা দরকার। দ্বিতীয়ত তুমি আমায় কিছু না ব'লে আমায় স্থধু নাকে দড়ি দিয়ে টেনে বেড়াবে সে চলবে না। আমি পুরুষ মানুষ।"

সহৃদয়তায় গদগদ হ'য়ে প্রহেলিকা বললে, "আহা, বেচারা! কিন্তু ছোট জাতে জন্মেছেন অদৃষ্টের দোষে, তাতে এতটা—"

"ছোট জাত! কুলীন বোস কায়েতকে বল ছোট জাত!"

"তা' কেন বলবো? বলছি, পুরুষ জাতটার কথা। পুরুষ যে ছোট জাত, এভোল্যুশনে নারীর অনেক পিছনে পড়ে আছে সে তো ঠিক।"

"ঠিক! বাঃ—"

"যাক এ নিয়ে তর্ক ক'রে কি হবে? একথা আপনারা প্রতিমুহূর্তে পদে পদে অনুভব করেন এবং সেই inferiority complexএর জন্যই পুরুষ আদিকাল থেকে সময়ে অসময়ে চীৎকার ক'রে জাহির ক'রে আসছেন যে তারাই বড়, মেয়েরা ছোট। যে সত্যি সত্যি বড় সে তার বড়ত্ব নিয়ে অমন বড়াই করে না। কিন্তু বলছিলাম কি? ছোট জাতে জন্মেছেন ব'লেই অতটা হতাশ হবেন না। যত্ন ও অধ্যবসায়ে পুরুষ ষোল আনা নারী হ'তে না পারলেও প্রায় কাছাকাছি আসতে পারে। শারীরিক ত্রুটি যে সব আছে আপনাদের, দাড়ি গোঁফ কামিয়ে, লম্বা চুল রেখে সেমিজ শাড়ীর নকলে জামা কাপড় প'রে তো অনেকটা সুধরে নিয়েছেন। মানসিক জগতে চেষ্টা ও সাধনায় আপনারা এর চেয়েও অনেক বড়—প্রায় পরিপূর্ণ নারী হ'য়ে উঠতে পারেন,- যেমন মহাত্মা গান্ধী হয়েছেন।"

"গান্ধী নারী! তোমার আস্পর্দ্ধা—"

"নন তিনি নারী? বলেন কি? দাড়ী গোঁফ বাদ দিলে পুরুষের বিশেষত্ব বা পুরুষত্ব কিসে? যুদ্ধে। নারী চিরদিনই অহিংসার পক্ষপাতী। যখন পুরুষ আদ্যোপান্ত অহিংস হয়ে ওঠে তখনই সে নারীর পদবীতে আরোহণ করতে পারে। তাই বলছিলাম পুরুষ হ'য়ে জন্মেছেন ব'লেই যখন তখন তা নিয়ে আপশোষ করবেন না, সাধনায় কি না হয়? কাজেই 'ক্লৈব্যং মাস্মগম'—চলুন।"

"বটে! তা পুরুষত্ব না হয় বাতিল হ'য়ে গেল—কিন্তু চা?"

"সে পথে হবে।"

প্রহেলিকা বেরিয়ে পড়লো।

১৭

বাঁড়ুজ্যে পড়াতে এসে দেখে ইলা ব'সে আছে, প্রহেলিকা নেই। এমনি গাফিলি তার রোজ হয় আজকাল, কিন্তু আজ একটু বাড়াবাড়ি। ইলা বল্‌লে প্রহেলিকা আজ পড়তে আসবেই না, ইলা একাই পড়বে।

পড়াবার মত মনের অবস্থা বাঁড়ুজ্যেরও ছিল না। ১৫ই ফাল্গুনের মহামুহূর্তের আয়োজনে সে হন্তদন্ত হ'য়ে রয়েছে।

তাই বইখানা সামনে খুলে রেখে সে ইলার সঙ্গে যে সব কথাবার্তা কইলে তার ভিতর বি-এ পরীক্ষার পাঠ্যবিষয় নেই বল্‌লেই চলে।

বাঁড়ুজ্যে বল্‌লে, "আপনার বন্ধুটির পড়াশুনায় মন বড্ড কম, কি বলেন ?"

ইলা বল্‌লে, "আমি কি বলবো বলুন, আমারই যা মন !"

"আপনার পড়ায় মন নেই ? বলেন কি ? আপনার মতন যদি আমা. সব ছাত্র-ছাত্রী হ'ত তবে ব'র্তে যেতাম।"

"জানেন প্রহেলিকার পড়ায় মন নেই তা' নয়, ও ভারী খামখেয়ালী। যখন যেটা খেয়াল হবে তা' ক'রে তবে ছাড়বে। নিয়ম ক'রে কিছু করতে হলেই ওর বিপদ।"

একটু চিন্তাকুলভাবে বাঁড়ুজ্যে বল্‌লে, "হুঁ, তা বটে। এমন লোক নিয়ে সংসার করার মানে যে সংসার করবে তার হাঙ্গামা আছে।"

ইলা হেসে বল্‌লে, "ও বলে কি জানেন ? বেটাছেলে দেখলেই ওর তাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে বা বাঁদর নাচাতে ইচ্ছে করে।"

"হুঁ, তাই বোধ হচ্ছে।"—একটু চিন্তাকুলভাবে বাঁড়ুজ্যে একথা ব'লে ভাবতে লাগলো। এ কথায় তার নাকের ডগাটা অযথা টন্‌টন্ ক'রে উঠলো, যেন সেখানে দড়ি বেঁধে সত্যিই কেউ টানছে।

"আচ্ছা আজ উনি গেলেন কোথায়? কারও নাকে দড়ি পরাতে নাকি?"

"জানি না তো। বল্‌লে, কি একটা বিয়ের উজ্জুগ—"

বাঁড়ুজ্যের বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ ক'রে উঠলো। কথাটা আশার ও আনন্দের, কিন্তু ওই নাকের ডগায় যেন কিসের টান লাগতে লাগলো।

"আচ্ছা, আপনি বিয়ে করবেন না?"

লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলো ইলা; স্থধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

"মানে, বিয়ে কি ঠিক হ'য়ে গেছে আপনার?"

সস্মিত হাস্যের সহিত ইলা বল্‌লে, "হুঁ।"

"বেশ, বেশ, নেমন্তন্ন খাওয়া যাবে তা হ'লে। হাঁ কবে বিয়ে হবে আপনার?"

"পরশু"।

"বটে? পরশু—অ্যাঁ—তা আপনার নিশ্চয় খুব আহ্লাদ হচ্ছে।"

"না, আমার বড্ড ভয় হচ্ছে—যাঁর সঙ্গে বিয়ে তিনি জানেন না, তাই বড্ড ভয় হচ্ছে।"

"ও কিছু ভয় পাবেন না। আপনার মত স্ত্রী যে পাবে, সে যত বড় হতভাগাই হোক, তার আপনার পায় প'ড়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। ওই আপনার বন্ধু যা বলেন নাকের দড়ি ধ'রে টানলেই নাচবে সে, যত বড় ভালুকই হোক।"

আবার ইলা লজ্জায় লাল হ'য়ে গেল। সে বল্‌লে, "যান, কি যে বলেন।"

"আমি জানি তাই ব'লছি। আমাদের জাতকে জানি, তার ভিতর

এমন মরদ কেউ নেই যে আপনার মত এতখানি রূপ আর এত গুণ দেখে আবার ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করবে। জানেন, আমরা—"

"খুব ক্যালকুলাস পড়া হচ্ছে যে দুজনে," বলে প্রহেলিকা এক পাঁজা কাগজের বাণ্ডিল হাতে ক'রে তীব্র কুটিল দৃষ্টিতে দুজনের দিকে চাইতে চাইতে প্রবেশ করলে।

বাঁড়ুজ্যে একেবারে নিভে গেল। কি বলবে ভেবে পেলো না।

প্রহেলিকা বল্‌লে, "ছি, মাস্টার ম'শায়, আপনার এই চরিত্র। পরশু আপনার বিয়ে আর আজ ওর 'এতখানি রূপ—এতো গুণের' প্রশস্তি গাইছেন? ছিঃ! বেটাছেলেকে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই!"

"না দেখুন, আমি সে রকম কিছু বলিনি, বলিছি কি?" প্রশ্নটা করা হ'ল ইলাকে।

ইলা ঘাড় নীচু ক'রে চুপ ক'রে ব'সে রইলো শুধু।

প্রহেলিকা আর কিছু না ব'লে, বোঁ ক'রে ঘুরে বাড়ির ভিতর যায় দেখে, বাঁড়ুজ্যে দাঁড়িয়ে উঠে আকুল কণ্ঠে বল্‌লে, "না দেখুন, ভারী অন্যায় হ'য়ে গেছে—আর দোষ হবে না। বিশ্বাস না করেন, এ কদিন না হয় আর পড়াতে আসবোই না।"

প্রহেলিকা ফিরে বল্‌লে, "আচ্ছা তবে এখন যান আপনি, আর আসবেন না। ১৫ই ফাল্গুনের engagement ঠিক থাকে যেন। এই ঠিকানাটা মনে রাখবেন।" ব'লে সে একখানা কাগজে ঠিকানা লিখে বাঁড়ুজ্যের হাতে দিলে।

বাঁড়ুজ্যে নিতান্ত অপরাধীর মত মাথা গুঁজে পায় পায় বেরিয়ে গেল।

প্রহেলিকা তারপর তার প্যাকেটগুলো খুলে ইলাকে দেখাতে লাগলো। চমৎকার চমৎকার শাড়ী জামা গয়না। দুই বন্ধুতে মিলে

ঝাড়া এক ঘণ্টা কাটিয়ে দিলে কেবল সেগুলোর রূপ উপভোগ ক'রে।

তাদের এই সম্ভোগের মধ্যস্থলে এলেন বিদূষক ম'শায়।

এসেই তিনি বল্‌লেন, "মেয়েছেলের লেখাপড়া শেখা মিথ্যে—ওতে কিছুই হয় না তাদের।"

প্রহেলিকা বল্‌লে, "তা ঠিক। লেখাপড়া শিখে উন্নতি হ'তে পারে পুরুষের, মেয়েদের হ'তে পারে না। পিতলকে গিণ্টী ক'রে স্থন্দর করা যায়, সোনার তাতে কোনও পরিবর্তন হয় না।"

"বটে! যাই হোক একথায় আমরা একমত, যে তোমাদের লেখাপড়া শেখাটা নেহাৎ বাজে খরচ। যতই পড় যতই লেখ, শাড়ী আর গয়নার মোহ তোমাদের বদলায় না, তাই ঐ শাড়ী গয়না দেখিয়েই পুরুষেরা তোমাদের গলায় অনায়াসে বঁড়শী বিঁধে দেয় তা' সে তোমরা নিরক্ষরই হও, আর বি-এই পাশ কর!"

প্রহেলিকা বল্‌লে, "ভুল, বিদূষক ম'শায়, ভুল। শাড়ীই দিক গয়নাই পরাক, আস্থক দেখি মরদ যে আমার গলায় বঁড়শী বিঁধাবে?"

"অন্তত একজন তো হালফিল পরাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। এখন ই স্থতো ছাড়ছে, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে ডাঙ্গায় তুলতে দেরী নেই!" তবে

"ফোঃ" ব'লে প্রহেলিকা অবজ্ঞা প্রকাশ ক'রে জিনিসগুলে' তুলে ইলার জিম্বা ক'রে দিলে। ণ। গুণ্ডা

ইলা চ'লে গেলে সে বল্‌লে, "বাজে কথা থাক .লে তোদের গিয়েছিলেন তার কি হ'ল? সন্ধান পেলেন?" ঢবে।"

"পেয়েছি। আজ সন্ধ্যেবেলা চাটগাঁ মেলে—"

"চাটগাঁ মেল তো আটটায় আসে। তবে ক কেন? যান।"

"এখানে এসেছি এক পেয়ালা চায়ের আশায়। না—আজ আর রাস্তায় গিয়ে চা খাবো না। আজকে, Polly put the kettle on."

"আচ্ছা দিচ্ছি চা," ব'লে প্রহেলিকা ভিতরে গেল। খানিক পরে চায়ের পেয়ালা হাতে ক'রে এসে সে বল্‌লে, "এদিককার বন্দোবস্ত সব ঠিক তো?"

"হাঁ ঠিক সব।"

১৮

এসব ঘটনার পূর্ব্বকাহিনীটা একটু বলা দরকার।

পূজোর ছুটির পর যেদিন কলেজ খুললো সেদিন প্রথম যে মেয়েটির সঙ্গে প্রহেলিকার দেখা হ'ল তাকে সে বললে, "কিরে তোর বিয়ে হয়নি এখনও? সারা ছুটিটা ব'সে কি করলি?"

ইলা ভট্টাচার্য বললে, "তুই-ই বা কি করলি তাই শুনি?"

প্রহেলিকা বললে, "আমি? আমার ভাই ওসব সুবিধে হবে না। জানিস, বিয়ে যদি করি আমি তবে দ্রৌপদীর মত পাইকেরী হিসাবে

ত হয়।"

আসবে ই নাকি? কেন বলতো?"

ঠিকানাটা , বেটাছেলে কিনা কুকুরের জাত, ওদের একটাকে যদি একটু

বাঁড়ুজ্যের হা মনি পালে পালে এসে তারা ল্যাজ নাড়তে থাকবে।

বাঁড়ুজ্যে

গেল। ন, "কাজেই বিয়ে না ক'রে ঝাঁক শুদ্ধ রাখতে চাস,

প্রহেলিকা তারপ

লাগলো। চমৎকার চমকা বললে, "না ভাই আমার কুকুরের সখ নাই।"

সুজাতা চোখ টেনে বললে, "বাবু মুগের ডাল খান না—পান না তাই খান না।"

প্রহেলিকা বললে, "ঈস্! দেখবি তবে? দেখাব?"

অশোকা বললে, "কি দেখাবি?"

"'তু' ব'লে ডাকলে এক সঙ্গে কটা আমি জোটাতে পারি।"

অশোকা বললে, "অত দেমাক করিস নে পলি—(কলেজে তার ডাক নাম পলি) এই বাঙলাদেশে, রূপে, গুণে, ধনে, মানে তোর চেয়ে খাটো নয় এমন ঢের মেয়ে বিয়ের পিত্যশে হাঁ ক'রে ব'সে রয়েছে, জানিস?"

"যাদের হাঁ ক'রে ব'সে থাকা ছাড়া আর কিছুর মুরোদ নেই তারা ব'সে থাকুক গে, বিয়ের জন্য যারা হেদিয়ে মরে তারা মরুক গে, কিন্তু আমি পুরুষ মানুষকে তুচ্ছ করি, তাদের দিয়ে কোনও প্রয়োজন নেই আমার। তাই আমার বিন্দুমাত্র ইসারা পেলে তারা গণ্ডায় গণ্ডায় ছুটে আসবে আমার কাছে। এই পুরুষদের স্বভাব।"

ইলা বললে, "তা আসতে পারে। দেশে গুণ্ডা বদমায়েসের অভাব নেই, তারা মেয়েদের দেখলে ঝাঁকে ঝাঁকেই আসতে চায়। কিন্তু তুই যদি মনে ক'রে থাকিস পলি যে তাঁদের কেউ বিয়ে করতে আসবে, তবে বড়ই ভুল বুঝেছিস।"

"ঈস্, ভারী বুড়ী ঠানদিদির মত বক্তৃতা শিখেছেন। গুণ্ডা বদমায়েসের কথা বলছি না, এমন সব ছেলে, যাদের দেখলে তোদের নোলায় জল পড়বে, তারাই এসে আমার পায় লুটিয়ে পড়বে।"

"বিয়ে করতে চাইবে?"

"নিশ্চয়।"

"কি ভুল তোর পলি—"

"ভুল, আচ্ছা দেখে নিস্—দেখিয়ে দেবো তোদের।"

অশোকা বল্‌লে, "তার মানে, তুই ছোঁড়াদের সঙ্গে ইয়ারকী সুরু করবি এই জন্যে?"

"দরকার হ'লে করবো, দেখাব তোদের।"

ইলা বল্‌লে, "সাবধান পলি, ও দুরন্ত খেলা খেলতে যাস নে, শেষে কিসের ভিতর জড়িয়ে পড়বি তুই তা জানতেও পারবি না।"

"ফোঃ, আমি তোদের মত অপদার্থ কিনা?"

প্রহেলিকা পুরুষ জাতকে এমনি কথা অনেক জায়গায় বলতো। একদিন সে ঐ কথাই বলছিল তার এক বয়োজ্যেষ্ঠা পিশতুতো বোনের বাড়িতে। সে বোনটির স্বামীর নাম বিধায়ক বসু। তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু তাঁকে দেখে কেউ ভাবতো বুড়ো কেউ মনে করতো নেহাৎ ছোকরা। তাঁর সামনের চুল প্রায় চৌদ্দ আনা সাদা, কিন্তু পিছনে সব চুল কালো কুচকুচে। মুখের উপর বয়সের রেখা বেশ পড়েছে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি যুবকের মত স্বচ্ছ ও কৌতুকোজ্জ্বল, আর সমস্ত দেহের গঠন ঋজু দৃঢ় শক্ত সুগঠিত। পিছন থেকে যারা তাঁকে চলতে দেখতো তারা ভাবতো একটি যুবক যাচ্ছে। সামনে থেকে যারা মুখের দিকে চাইতো তারা ভাবতো বুড়ো, কিন্তু যারা মুখের নীচে চাইতো তারা যুবা ছাড়া আর কিছু মনে করতো না।

প্রহেলিকা তাঁকে বলতো দোমুখো দেবতা Janus—যার একটা মুখ বুড়োর আর একটা মুখ ছোকরার। কিন্তু সুধু এই এক নামেই সে তাকে চিরদিন ডাকতো না। বার দুই তাঁর দুর্বুদ্ধি হয়েছিল তিনি প্রহেলিকার বিয়ের প্রস্তাব এনেছিলেন এবং যোগাযোগ করে প্রহেলিকাকে না জানিয়ে নিজের বাড়িতে তাকে প্রস্তাবিত বরের সঙ্গে দেখাও করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রস্তাব বেশী দূর অগ্রসর হয় নি।

প্রহেলিকা বিয়ে করতে এত পরিপূর্ণভাবে অস্বীকার করলে যে তাঁর এ দৌত্যের কোনও ফল হল না।

তখন প্রহেলিকা তাঁর নাম দিলে বিদূষক, কেননা সংস্কৃত নাটকে বিদূষকের একটা লক্ষণ এই যে, তারা নায়ক নায়িকার প্রণয়ের সহায়ক।

বিধায়কের বাড়িতে প্রহেলিকা সেদিন বললে, "মেয়েরা যে কোন্ দুঃখে যেচে ঐ বিশ্রী নোংরা পুরুষগুলোকে বিয়ে করতে চায় তাই আমি ভাবি। বাপ মা ধ'রে বিয়ে দিতে পারে, কিন্তু নিজে আপন খুসীতে তারা বিয়ে করতে যায় কি দেখে?"

বিধায়ক বললে, "ঠিক ঐ রকম প্রশ্নই আমরা—যারা মুখ পুড়িয়েছি—পুরুষদের সম্বন্ধেও জিজ্ঞেস ক'রে থাকি? আসল কথা কি জান, কি পুরুষ, কি নারী কারও অপরকে বিয়ে করতে চাইবার পক্ষে কোন টেঁকসই যুক্তি নেই—যেমন আগুনের আঁচ লাগলে মোমের গলে যাবার পক্ষে কোনও যুক্তি নেই। কিন্তু এই অহেতুক অযৌক্তিক এবং সম্পূর্ণ লজিক নিরপেক্ষ কাণ্ডই দিন রাত জগতে হচ্ছে। আগুনের পাশে গেলেই মোম গলে যাচ্ছে, আর পুরুষের সামনাসামনি মেয়েরা এলেই অমনি সব যুক্তি তুচ্ছ ক'রে তারা গলে যাচ্ছে। অন্যায় এসব—লজিকের কোনও কোটায় পড়ে না এসব—কিন্তু তবু হয়।"

"আপনি যে পুরুষ তা আপনার এ কথার ভিতরকার স্পষ্ট পক্ষপাত থেকেই ধরা যায়।"

বিধায়ক বাধা দিয়ে বললে, "আমি যে পুরুষ সেটা প্রমাণ করবার জন্য অমন ঘোরালো যুক্তির কোনও দরকার আছে কি? এর চেয়ে সোজা প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি নেই?"

"না নেই। গোঁপ দাড়ী যদি নাও কামাতেন আপনি তা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যেতো না; কেন না মেয়েদের মধ্যেও যে তা একেবারে

না দেখা যায় তা' নয়। কিন্তু এই কথাতেই ধরা পড়ে গেছেন। আপনি বললেন, মেয়েরা পুরুষের কাছে এলেই গলে যায়। যদিও আপনি অবশ্যই জানেন যে খাঁটি সত্যটা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।"

"আমার তো বিশ্বাস তা নয়।"

"নয়? একটা মেয়েকে পথে দেখলে হাজার পুরুষ অমনি চঞ্চল হয়ে ওঠে। বলতে পারেন কটা মেয়ে পথে হঠাৎ পুরুষ দেখলে তেমনি চঞ্চল হয়ে ওঠে?"

"এ বিষয়ে statistics নেওয়া হয়নি কখনও—কেন না, তাতে অনেক বিঘ্ন আছে। ছেলেদের চাঞ্চল্য নেহাৎ বাহ্যিক ব্যাপার, সেটা চট ক'রে ধরা যায়, মেয়েদের যেটা হয় সেটা সম্পূর্ণ মনের ভিতর হয়, ধরা ভারী শক্ত—ফল্গুর ধারা কিনা!"

"চান আপনি statistics? আমি দেখিয়ে দেবো। আসবেন মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে বেড়াতে। যারা আমাকে দেখে চঞ্চল হয় সে পুরুষদের সংখ্যা নেবেন। আর কোনও পুরুষ দেখে আমাকে চঞ্চল হতে দেখেন তবে—"

বিদূষক বললেন, "এটা খুব ন্যায্য তুলনা হবে না। তুমি হলে রূপসী, যুবতী, আর বিশেষ করে রসবতী। পক্ষান্তরে, তুমি যাদের দেখবে তাদের শতকরা নিরানব্বইজন হয়তো কদাকার—"

হেসে প্রহেলিকা বললে, "পুরুষ আবার কদাকার ছাড়া কখনও হয় নাকি?"

"কি জান? এর উত্তর দিতে গেলে নিজের মুখে বড়াই করতে হয়, কিন্তু নিরপেক্ষ মত চাও তো তোমার দিদির কাছে—"

"ঈস্, ভারি দেমাক দেখছি আপনার, বিদূষক ম'শায়। আচ্ছা বেশ, আপনি পুরুষদের মধ্যে যাকে আমার সমান রূপবান, রসবান,

গুণবান মনে করেন তাদের নিয়েই আপনার আদম স্থমারী করবেন। আসবেন আমার সঙ্গে—standing invitation রইল।"

এর পরে একদিন প্রহেলিকা বিধায়কের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল, সেদিন সে দেখতে পেলে দূর থেকে নিখিলেশ তাকে যেন চোখ দিয়ে গিলতে চাইছে।

বিদূষককে সে বললে, "ঐ দেখছেন? ও বোধ হয় সাধারণ পুরুষের চেয়ে বেশী কদাকার নয়, কি বলেন?"

বিদূষক বললেন, "না রূপের দিক দিয়ে ওর ত্রুটি নেই—যদিও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে অনেক কিছুই বলা যায়।"

"দেখলেন তো?"

তার পরদিন প্রহেলিকা তার ছোট এক বোনঝিকে নিয়ে লেকে বেড়াতে গিয়েছিল। সেদিন নিখিলেশ খামকা এসে তার বোনঝিকে কতকগুলো বেলুন, চকলেট প্রভৃতি কিনে দিলে।

তা' দেখে প্রহেলিকা হেসে আকুল হয়ে গেল।

দুটো একটা কথা কইতেই নিখিলেশ কৃতার্থ হয়ে তার সঙ্গ নিলে। কথায় কথায় সে তার পরিচয় গোপন করতে পারলে না; সে যে ফার্ষ্ট ক্লাশে এম-এ পাস করেছে সে কথা পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে গেল।

এ খবরটা যখন জানা হয়ে গেল তখন প্রহেলিকা হেসে বললে, "তবে এখন আমি পালাই"—ব'লে সে যেন উড়ে চ'লে গেল।

বাড়ী ফিরবার পথে তার দেখা হল বিধায়কের সঙ্গে। সে তাকে জানালে যে সুধু রূপে নয়, গুণেও নিখিলেশ তুচ্ছ নয়।

বিদূষক বললেন, "তা হ'লে চিন্তার বিষয়!"

"মানে? কার জন্য চিন্তা?"

"তোমার জন্যেই।"

"বটে, আচ্ছা দেখুন।"

তারপর নিখিলেশ যখন বেশ স্পষ্টভাবে আহত হয়েছে দেখা গেল তখন সে একদিন অশোকাকে সঙ্গে নিয়ে গেল সেই মনিহারী দোকানে। সেখানে নিখিলেশের সঙ্গে দেখা হল, কিন্তু কোনও কথা হল না।

অশোকাকে প্রহেলিকা বললে, "ঐ ছোকরাকে দেখলি? কেমন? সুপুরুষ নয়?"

অশোকা বললে, "হাঁ ভাই, খাসা চেহারাখানা।"

"শুধু চেহারা নয়, ও ফার্ষ্ট ক্লাশ এম-এ, আর বোধ হয় বেশ বড়লোক।"

অশোকার এবার একটু সন্দেহ হ'ল, সে বল্‌লে, "তাই কি? নাচতে থাকবো?"

হেসে প্রহেলিকা বল্‌লে, "ঠাকুর ঘরে কে? আমি কলা খাই না। তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে যে, নাচতেই লেগেছিস্‌ তুই। আচ্ছা বেশ, দুদিন আয় তুই আমার সঙ্গে, মজাও দেখবি আর বাঁদর নাচ শেষ হ'লে ওকে বগল-দাবা ক'রে ঘরেও নিয়ে যাবি।"

"পোড়ারমুখী!" ব'লে অশোকা তাকে চিমটি কাটলে। কিন্তু এলো সে প্রহেলিকার সঙ্গে।

সেদিন সে বিধায়ককে ব'ল্লে, "দেখুন, আমি পুরুষ জাতের উপর অবিচার ক'রেছি।"

বিধায়ক ব'ল্লেন, "যা' হ'ক এ কথাটা যে এত শীগ্‌গির বুঝতে পেরেছ সেটা পুরুষের ভাগ্যের কথা। তা' যিনি এ মত পরিবর্ত্তন করালেন তোমার, সে ভাগ্যবান কে, জানতে পারি কি?"

তাঁকে অগ্রাহ্য ক'রে প্রহেলিকা ব'লে গেল, "দেখতে পাচ্ছি, বাঁদরের

দুই জাত আছে—পুরুষ ও নারী। দুজনকেই নাকে দড়ি দিয়ে নাচান যায়।”

“অতিশয় সত্য কথা! বিশেষ যেখানে স্বয়ং প্রহেলিকাকে—”

“তবু বরং পুরুষেরা ভাল,—”

“Bravo! আজ তুমি এত সব ছাঁকা সত্যি কথা ব'লছ যে তোমাকে খাইয়ে দিতে ইচ্ছে হ'চ্ছে। চল আজ ফার্পোর ওখানে—”

“আজ নয়, আর একদিন হবে—যে দিন যাব আপনাকে খবর দেব। কিন্তু ব'লছিলাম কি? মেয়েগুলো ক্ষেপে ওঠে—পুরুষের মত কদাকার একটা জানোয়ার দেখে। পুরুষেরা অন্ততঃ সে ভুলটা করে না। তারা বাঁদরামী করে বটে কিন্তু পুরুষ দেখে নয়—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি নারীকে দেখে।”

একটা মস্ত বড় ঢোঁক গিলে বিধায়ক ব'ল্লেন, “ও, এই কথা।”

প্রহেলিকা ব'ল্লে, “কথাটা বোধ হয় পছন্দ হ'ল না; কেমন?—কিন্তু তাই ব'লে ফারপোয় যাবার নেমন্তন্নটা ফিরিয়ে দিচ্ছি নে।—রইলো সেটা।”

ব'লে সে আঁচল উড়িয়ে চ'লে গেল।

বিধায়ক চেয়ে দেখলেন—ঘরের ভিতরটা যেন সঙ্গে সঙ্গে নিতান্তই অন্ধকার হ'য়ে গেছে।

* * *

এর পর প্রহেলিকার পথে প'ড়লো বাঁড়ুজ্যে।

বাঁড়ুজ্যে যখন তাকে প্রথম পড়াতে এলো তখন তার চেহারা দেখে প্রহেলিকার মনের ভিতরটা কেবলি সুড় সুড় ক'রতে লাগলো। দু'দিন না যেতেই সে দেখতে পেলে যে এ বেশ নাচাবার মত মানুষ। শিকারী

বেড়ালের মত পায় পায় সে এগুতে লাগলো কিন্তু ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সে যে তাকে হঠাৎ আক্রমণ ক'রবে এ কল্পনা তার তখনও মনে আসে নি।

এ খেয়ালটা তার হ'ল, যেদিন শ্রীবিলাস এলো। সেদিন মাষ্টার ম'শায়কে দুটো টোকা দিতেই সে বুঝতে পারলে যে হর্য্যক্ষবিক্ষোভ নিতান্ত সহজ শীকার। বিনা দ্বিধায় সে তার ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে কায়দা ক'রে নিলে।

প্রহেলিকার প্রথম মতলব ছিল শুধু পুরুষজাতি সম্বন্ধে তার প্রচুর অশ্রদ্ধাটা হাতে কলমে প্রমাণ ক'রে দেওয়া। কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে সে এই যুবকদের নিয়ে খেলা সুরু ক'রে ক্রমে সে এই খেলায় প্রচুর আনন্দের সন্ধান পেলে। তার একটা রোখ চ'ড়ে গেল পুরুষদের বোকা বানাবার এই খেলা খেলতে।

তার রকম সকম দেখে বিধায়ক একদিন বল্‌লেন, "পলি এইবার সাবধান! আর সামলাতে পারবে না।"

তাঁর স্ত্রী প্রহেলিকাকে বল্‌লেন, "এ কি সব ছিষ্টিছাড়া কাণ্ড তুই করছিস? বাপ-মার নাম হাসাবি?"

পলি বল্‌লে, "না দিদি, নাম হাসাব না, উজ্জ্বল করবো। সাতকাল পুরুষবাবুরা মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন। আমি তাঁদের একবার দেখে নেবো। সবগুলোকে নাকে দড়ি দিয়ে নাচাব।"

বিধায়ক বল্‌লেন, "Bravo! আমি পুরুষবাবুদের পক্ষে তোমার এ চ্যালেঞ্জ সানন্দে গ্রহণ করছি, কেননা আজ হোক, কাল হোক, এতে নাকে দড়ি পড়বে তোমারই।"

"ফোঃ! দেখে নেবেন।"

* * *

শ্রীবিলাস তার হাতে এসে পড়লো আচমকা। বিয়ের কথা

কইতে এসে সে যে কাণ্ডটা করলে, তাতে প্রহেলিকা রাগে গর্‌গর্‌ করতে লাগলো। তাকে জব্দ করবার কথা মনে হ'ল।

এ বাড়ীতে তার বিয়ে হয়, এটা তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। ভাবতে ভাবতে তার মনে হ'ল তার এক দূর সম্পর্কের বোন অলকার কথা। অলকার বাপ বিশ্রীরকম বড়লোক, অর্থাৎ এত বড়লোক যে, রোজ দু দশটা লোককে অপমান ক'রে কথা না কইলে তাঁর ভাত হজম হয় না। আর বাপের দেমাক যদি হয় রোদ তবে তার মার দেমাক তপ্তবালি—আরও অসহ্য! অলকার দেমাকের কথা প্রহেলিকা ব'লতো তিন ছয় আঠার—অর্থাৎ তার বাপের ও মায়ের দেমাকের যোগফল নয়, গুণফল।

স্থধু দেমাক নয়, মেজাজ তার বিষম তিরিক্ষি। বাড়ির বা বাইরের সবার উপর সে চটেই আছে দিন রাত, আর যাকে নিতান্তই সে চড় চাপড় না মারে তাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ ক'রতেই থাকে।

প্রহেলিকার জানা ছিল যে এহেন অলকার বিয়ের একটা কথা হয়েছিল। ছেলের পক্ষে মেয়ে দেখবার প্রস্তাব শুনে তার বাপ বলেছিলেন, "আমার মেয়ে—তার উপর নগদ দশ হাজার টাকা পাচ্ছে। আবার মেয়ে যাচাই করতে চান!—ওসব মেয়ে দেখা ফেখা হবে না।"—এর কারণ এমন নয় যে অলকা দেখতে কিছু মন্দ। দেখতে শুনতে সে চলনসই রকম, আর রূপ তার যা আছে তার উপর রং মেখে আর কাপড় চোপড় গয়নার চটকে সে বরং তাক লাগিয়ে দেয় দশগুণ। তবু দেখাবেন না তার বাপ,—এটা তাঁর দেমাক!

সবদিক ভেবে, দেখলে প্রহেলিকা যে এই অলকাই শ্রীবিলাসের উপযুক্ত শাস্তি। তাই সে প্রথমে শ্রীবিলাসকে বাঁড়ুজ্যের মারফৎ অলকার খবর দিলে।

তার পর হ'ল তার আরও দুষ্টবুদ্ধি, তাকে আর খানিকটা নাকাল করবার। তাই সে করলে সেই swimming poolএর কাণ্ড।—তাতে যে শ্রীবিলাস শেষে ঘাড়ে চাপবে এ ভয় সে করেনি। সে ভেবেছিল যে অলকার বাপের হাত থেকে শ্রীবিলাস ছাড়ান পাবে না কিছুতেই।

কিন্তু এর পর একদিন সে শুনতে পেলো যে শ্রীবিলাসের বিয়ের আয়োজন হ'চ্ছে, অলকার বাড়ীতে নয় তাদেরই বাড়ীতে।

তার বিমল আনন্দের উপর এতে একটা গভীর ছায়াপাত হ'ল।

* * *

প্রমোদের সঙ্গে যখন তার প্রথম দেখা হ'ল তখন প্রহেলিকা তাকে সামান্য দোকানদার ব'লে অগ্রাহ্য ক'রেছিল।

তার পর সে জানতে পারলে যে সেও এম-এ পাশ—আর স্বধু এম-এ পাশ নয়, স্বয়ং "উড়োজাহাজে"র লেখক।

প্রথম যেদিন তার বোনঝি তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল প্রমোদের দোকানে সে দিন প্রমোদ তাকে দেখে যে দারুণ হকচকিয়ে গিয়েছিল, তাতে প্রহেলিকা বিরক্তই হ'য়েছিল। তুচ্ছ একটা দোকানদার তার এত বড় স্পর্দ্ধা হবে যে প্রহেলিকাকে দেখে চোখ দেবে! কিন্তু যখন প্রমোদের পরিচয় সে পেলো তখন সেদিনকার সেই কথা মনে হ'য়ে তার হাসি পেলো!

স্বয়ং "উড়ো জাহাজে"র লেখক, যিনি মেয়েদের মনের কথা কলমের খোঁচায় কেটে ছিঁড়ে খোলসা ক'রে লিখতে পারেন, তিনিও নিতান্ত সাধারণ পুরুষের মত একটা মেয়ের অঙ্গুলি সঙ্কেতে নাচতে প্রস্তুত!

দু চার দিন নাড়া চাড়া ক'রে দেখতে পেলে, প্রমোদ যেন অন্যগুলির চেয়েও সহজ শীকার। সে বাঁদরনাচ নাচবার জন্য পা' যেন তুলেই র'য়েছে।

সগর্বে তার এই আবিষ্কারের কথা বিধায়ককে জানিয়ে সে ব'ললে, "এই নিন। রূপগুণ সব দিক দিয়েই তো ইনি আপনাদের জাতের রংএর টেক্কা! এঁর কাণ্ডটা দেখছেন তো?"

"দেখছি—আর দেখে উদ্বিগ্ন হ'চ্ছি।"

"উদ্বেগের হেতু?"

"ঐ রংএর টেক্কা কথাটা!"

"হুঁ-হ্! ভুলে যাবেন না যে রংএর টেক্কার দাম আছে স্বধু তার কাছে যে তাস খেলতে বসে। যে সে খেলার রসিক নয়, তার কাছে রংএর টেক্কা, ঠিক আর সব তাসের মতন—স্বধুই কাগজ!"

"আর একটা কথা মনে প'ড়ছে। বারে বারে যে ছাগল ধান খেয়ে যায় তার—"

"ছাগল, ছাগলই। ধান খাক বা না থাক মরতেই হবে তার একদিন। কিন্তু বিদূষক ম'শায়, আমি ঠিক ছাগলের মত বুদ্ধি রাখি না।"

তার পর, প্রমোদ যেদিন হঠাৎ উধাও হ'য়ে গেল, আর যাবার পর খোঁচা মেরে গেল তার "নিঃশেষ" গল্পটা লিখে—সেদিন প্রহেলিকা খেলে একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবলে, "এ কি ছিঁচ কাঁদুনে বাপু!"

প্রমোদ তাকেই লক্ষ্য ক'রে গল্পটা লিখেছে—এতে সে তার অপমান ক'রেছে। তাই তাকে সামনা সামনি দুটো কথা বলবার জন্য সে অস্থির হ'য়ে উঠলো।

বিধায়ককে সে ব'ললে, "আপনার রংএর টেক্কার কাণ্ডটা দেখলেন। টেক্কা না টেক্কা—এর নাম কাপুরুষ! সামনা সামনি কথা কইবার সাহস নেই, মারেন শব্দভেদী বাণ।—দেখুন এর একটা হিল্লে ক'রতে হবে। ওকে আমার চাই।"

উল্লসিত হ'য়ে বিধায়ক ব'ললেন, "বহুৎ আচ্ছা, তা হ'লে এই কদাকার নোংরা একটা পুরুষকে তুমিও চাও।"

অপ্রস্তুত হ'য়ে প্রহেলিকা ব'ললে, "না গো ম'শায়, না। তাকে আমি তেমন ক'রে চাই না, চাই দু ঘা' দেবার জন্য।"

"এ বিষয়ে তোমার কোনও প্রচণ্ড বৈশিষ্ট্য আছে তা' স্বীকার ক'রতে পারি না। অনেক মেয়েই পুরুষকে চায়—দু ঘা' দেবার জন্যই, আর একবার গাঁটছড়া বাঁধা হ'য়ে গেলে, বেশ দু ঘা' দেয়ও !"

একটু গম্ভীর হ'য়ে প্রহেলিকা ব'ললে, "ওসব বাজে কথা রাখুন। এখন একটা কাজ ক'রবেন কিনা বলুন। ও ব্যক্তি কোথায় গেল তার খবর আমাকে এনে দেবেন—এবং আমার সামনা সামনি তাকে এনে দাঁড় করিয়ে দেবেন। পারবেন ?"

"অবিশ্যি পারবো। তা নইলে বিদূষক আছে কি ক'রতে ? বিশেষ, যেখানে স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে এইবার ছাগলের ধরা পড়বার পালা।"

প্রহেলিকা ভ্রূকুটি ক'রে ব'ললে, "এ না হ'লে পুরুষ। ফি দানে হেরে তবু হার মানবেন না।"

"আচ্ছা, দেখাই যাক এই দানটা !"

১৯

সেদিন দোকানে চাবী বন্ধ ক'রে প্রমোদ পাগলের মত ছুটে গিয়েছিল তার সেই ভূতপূর্ব্ব হবু খদ্দেরের বাড়ী।

সে ভদ্রলোক প্রমোদের দোকানটা কেনবার আশা এখনও একেবারে ত্যাগ করেন নি। মাঝে মাঝে দোকানে এসে গল্পচ্ছলে অনেকবার তিনি দোকান কেনার প্রস্তাবটা ঝালাবার চেষ্টা ক'রে গেছেন। কিন্তু ইদানীং প্রমোদের কাছে বড় ক'ল্কে পান নি।

আজ প্রমোদকে স্বয়ং তাঁর কাছে আসতে দেখে তিনি হেসে ব'ললেন, "কি প্রমোদ বাবু? কি খবর?"

প্রমোদ বললে, "দোকান কিনবেন?"

ভদ্রলোক অনায়াসে বুঝলেন এবার গরজ প্রমোদের। তিনি মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ব'ললেন, "তাই তো, তখন দিলেন না, এখন ব'লছেন—টাকাটা লাগিয়ে ফেলেছি। তা' ছাড়া যুদ্ধের বাজার—"

উত্তপ্তভাবে প্রমোদ ব'ললে, "বাজে কথা রাখুন, স্পষ্ট ক'রে বলুন কিনবেন কি কিনবেন না।"

নিরুৎসাহভাবে লোকটি ব'ললে, "কত চান?"

"যা' কথা ছিল।"

"সে হয় না এখন? এখন যদি পাঁচশোতে ছাড়েন"—প্রমোদ চ'লে যায় দেখে—"না হয় ক'ষে মেজে জোর ছ'শো—"

প্রমোদ হাত পেতে ব'ললে, "দিন।"

ছ'শো টাকা পকেটে পুরে রসীদ লিখে প্রমোদ দোকানের চাবী তার হাতে গুঁজে দিয়ে তার মেসে গেল।

সেখানে একটা ট্যাক্সি ডেকে তার মাল পত্র চড়িয়ে সে চ'ললো সোজা উত্তর দিকে।

এক ছুটে সে উঠল গিয়ে একেবারে শহরের উল্টো পিঠে বেলগাছিয়ার কাছাকাছি একটা মেসে।

ছোট ছেলেরা যেমন ক্ষিদে পেলেই কাঁদে, প্রমোদ তেমনি কোনও আবেগ হ'লেই কাগজ-কলম নিয়ে বসে। কাজেই মনের ভিতর আগুন ছুটছে যখন, তখন মেসে ব'সতে পেয়েই সে কাগজ-কলম নিয়ে ঘস্ ঘস্ ক'রে কলম চালাতে লাগল—খস্ খস্ ক'রে কাগজ উল্টে গেল—সে

মনের আগুন যেন স্টীম এঞ্জিনের মত তার কলমকে ঠেলা মেরে চালাতে লাগল।

দেখতে দেখতে লেখা শেষ হ'য়ে গেল। একবার প'ড়ে দেখলে সে, হাঁ ঠিক মনের মত হয়েছে।

মেসে এসে তার জিনিসপত্তর তখনও কিন্তু গোছান হয় নি, মুটেরা যেমন যা' ফেলে গেছে, তেমনি তা' রয়েছে।

রইল সব প'ড়ে। গল্প বগলে ক'রে সে ছুটল সব মাসিক সাপ্তাহিকের অফিসে।

দেরী? দেরী সে সইতে পারবে না। তিন দিনের মধ্যে গল্পটা বের হ'তেই হবে। সব সম্পাদকই বললেন, এত শীগগির হয় না। শেষে এক দৈনিক কাগজে পরদিনই গল্প বেরিয়ে গেল। এইটাই সেই 'নিঃশেষ'।

গল্পটির কথা বস্তুটি খুব মৌলিক নয়। টেনিসনের Lady Clara Vere de Vere কবিতার ইঙ্গিত নিয়ে মোটের উপর প্লটটির রচনা। সুচরিতা রূপসী, শিক্ষিতা, রসিকা ধনিনী। মোট কথা, একাধারে সকল গুণের সমষ্টি, একদম প্রহেলিকা! কিন্তু সে হৃদয়হীনা। সুধু তাই হ'লে দোষ ছিল না তত! —সে পুরুষদের যেমন জোরে আকর্ষণ করে, তেমনি তারা হাতের মুঠোয় এলে হেলায় খেলার খেয়ালে তাদের আছড়ে ফেলে দেয় দূরে! তারা যে চুরমার হ'য়ে আর্তনাদ ক'রে ওঠে, তাতেই সুচরিতা খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে। এহেন সুচরিতার নেকনজর পড়ল নেহাৎ গরীব এক ক্ষুদ্র কবির উপর। চারুব্রত নিজেকে উজাড় ক'রে সুচরিতার দাসত্ব করলে, তার সব খামখেয়ালীর অত্যাচার মহাপ্রসাদ ব'লে তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করলে, এক বচ্ছর। সুচরিতা তাকে নিয়ে কত খেলাই খেললে, ভালবাসার কত না অভিনয়

করলে। কিন্তু এক বছর পর তার খেলার সখ মিটে গেল। তখন সে চারুব্রতকে দূর ক'রে দিলে। দূর থেকে তবু তাকে দেখবার আশায় চারুব্রত ঘুর ঘুর ক'রে তার আশে পাশে ঘুরে বেড়াত। সেজন্য শেষে সে চারুর পেছনে পুলিশ লাগিয়ে তাকে নাকাল করলে। পুলিশের গুঁতোয় তার আর্তনাদ শুনে সে হেসে গড়িয়ে পড়ল, বললে, "কিগো নাগর, প্রেমের কামড় লাগছে কেমন ?"

চারুব্রতর আর কিছু ছিল না, ছিল স্বধু তার লেখা অনেকগুলি কবিতা, একদিন স্থচরিতা যার ভারী প্রশংসা করেছিল। সেই কবিতার খাতাগুলো সে জড় ক'রে রচনা করলে এক চিতা। সর্বাঙ্গে কেরোসিন মেখে সে সেই চিতার উপর শুয়ে তার শেষ সিগারেট ধরাবার জন্য দেশালাই জ্বাললে—সেই শয্যায় শুয়ে সে নিঃশেষ হ'য়ে গেল।

এমন গল্প অনেক আছে। কিন্তু প্রমোদ এটা লিখেছিল তার বুকের রক্ত দিয়ে। তাই তার বেদনা সে কাহিনীর অক্ষরে অক্ষরে এমন জ্বলন্ত হ'য়ে ফুটে উঠেছিল যে, চারুব্রতের সে চিতার আগুন পাঠকের মনের ভিতর যেন আগুনের স্পর্শ লাগিয়ে দিল। সারা বাঙলা সাশ্রুনয়নে সে কাহিনী পড়ল।

প্রমোদের খ্যাতি রটে গেল দু'দিনে। মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও পাবলিশারেরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে তার লেখা চাইলে। সবাই ভাবলে এবার প্রমোদের পোয়াবারো।

কিন্তু সকলকে প্রমোদ ফিরিয়ে দিলে। সে বললে, আর প্রতিজ্ঞাও করলে যে "নিঃশেষ"ই তার শেষ লেখা। আর কথা বেচে খাবে না সে।

তবে করবে কি ? এ প্রশ্নের কোনও উত্তর তার মনে এল না চট্ ক'রে।

চারুব্রতের মত মরতে সে চায় না! কিন্তু বাঁচবারও সাধ নেই। মরবার সোজা পথ, যাতে আত্মহত্যার গ্লানি বা কাপুরুষতা নেই, সে তার হাতেই ছিল। সেইদিনই সে যুদ্ধে পাইলট হবার জন্য নাম লেখালে।

মেডিক্যাল একজামিনেশন হ'য়ে গেলে সে গেল দেশে। সেখান থেকে ফিরে এসে তার ট্রেনিংয়ের জন্য পশ্চিমে যাবার কথা—২৫শে ফাল্গুন।

প্রথমে সে নাম লিখিয়েছিল বৈরাগ্যের ঝোঁকে। কিন্তু এই নিয়ে ঘোরাফেরা আর আলোচনা করতে তার উৎসাহপ্রবণ চিত্তে জেগে উঠল নূতন উন্মাদনা।

সে অস্থিরভাবে অপেক্ষা করতে লাগল যুদ্ধে যাবার অবসরের। তার ট্রেনিংয়ে যেতে যে ক'দিন দেরী, তাই তার সইছিল না। পৌরুষ প্রতিষ্ঠার এ অভিনব অবসরের নেশা তাকে একেবারে পেয়ে বসল।

মেডিক্যাল একজামিনেশন হ'য়ে গেলে সে দেশে গেল। দেশে গিয়ে সে দেখতে পেলে কাগজে তার নাম ছাপা হ'য়ে গেছে। তাতে লিখেছে "উড়োজাহাজের প্রসিদ্ধ লেখক প্রমোদবাবু উড়োজাহাজ চালক হ'য়ে যুদ্ধে চলেছেন। আমরা তাঁর এ উৎসাহ ও উদ্যমকে অভিনন্দন করছি।"

ছাতি ফুলে উঠল তার।

ব্যর্থ-প্রণয়ের ব্যথার শেষ চিহ্নটুকুও তার মন থেকে দূরে হ'য়ে গেল। সে এখন কল্পনায় শুনতে লাগল তার পৌরুষ ও গৌরবের প্রশংসার দুন্দুভিনাদ, জাগ্রত স্বপ্নে সে সমরাঙ্গনে গিয়ে জার্মানদের বিধ্বস্ত, হিটলারকে বিনষ্ট করতে লাগল।

মরণের লোভে এসেছিল সে এ পথে, গৌরবের লোভে র'য়ে গেল।

খবরের কাগজের লেখা দেখে সে মনে করলে যে, তার এ অভিযান নিয়ে কলকাতায় নিশ্চয়ই খুব হৈচৈ লেগে গেছে। যখন সে সেয়ালদহ স্টেশনে নামবে, তখনই হয়ত দলে দলে লোক আসবে তাকে অভিনন্দন ক'রতে।

স্টেশনে গাড়ি লাগতেই সে দেখলে, তার অনুমান মিথ্যা নয়। অনেক বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের ভিড় দেখলে। সদর্পে সে লাফিয়ে প'ড়ল প্ল্যাটফরমে।

বন্ধুর দল তাকে ঘিরে দাঁড়াল। সে হাসিমুখে তাদের সম্ভাষণ করলে তাদের সপ্রশংস সম্বর্ধনার প্রতীক্ষায়।

কিন্তু—

প্রথমে তাকে যিনি সম্ভাষণ করলেন, তিনি তার এক পিশে। তিনি বললেন, "এ কি পাগলামী করছ? যুদ্ধ জিনিসটা কাব্য নয়, কল্পনার বিমানে চ'ড়ে বেড়াতে আরাম আছে, কিন্তু কলের বিমান সে বস্তু ঠিক নয় বাবাজী—বিশেষ, যদি তাতে গোলাগুলির কারবার থাকে। কেন তোমার এ উদ্ভট খেয়াল হ'ল বল তো? ও-সব হবে না বলছি।"

প্রমোদের উৎসাহ তার গৌরব-বোধ থেকে এখন আর তেমন জোর পেল না। বরং এই নিতান্ত বস্তুতান্ত্রিক বর্ষীয়ান বাঙালী ভদ্রলোকের কাছে কাব্যময় গৌরবের ভাষা ব্যবহার করতে সে একটু লজ্জাও অনুভব করলে।

সে স্বধু হেসে বললে, "সে সব আর এখন ভেবে কি হবে? ভর্তি তো হ'য়ে গেছি, এখন তো ইচ্ছা করলেও ছাড়ান যাবে না।"

অমনি আর একজন বললে, "ছাড়ান যাবে না না হাতী। চল তুমি আমার সঙ্গে। আমি তোমাকে medically unfit করিয়ে দিচ্ছি।"

"কিন্তু সে পরীক্ষা যে হয়ে গেছে।"

আর একজন অমনি বললে, “তা হ’লেও হয়। ওই তো নন্দী—সেও ভর্তি হয়েছিল। তারপর তার একটা accident হয়েছে ব’লে ডাক্তার দিয়ে হাতের গোটা দুই আঙুল কাটিয়ে নিয়ে সে দিব্যি খালাস পেয়ে গেল।”

প্রমোদ বললে, “বাবা! আঙুল কাটাতে হবে—”

“কাঁচা মাথাটা গুঁড়ো হওয়ার চেয়ে তো সে ভাল।”

অমনি আর একজন, “আরে তাও দরকার হবে না। আই-বি’কে দিয়ে একটা রিপোর্ট করিয়ে আমি তোমায় ভারত রক্ষা আইনে ধরিয়ে দিচ্ছি চল। আমার এক বন্ধু আছে সেখানে, বললেই সে খুসী হ’য়ে করবে।”

“তার মানে জেলে প’চতে হবে—”

“বিদেশে বিভুঁয়ে কোন খানায় প’ড়ে থেকে বেঘোরে প’চে মরার চেয়ে ঢের ভালো।”

ফল কথা, যারা খবর পেয়ে ষ্টেশন থেকেই তাকে পাকড়াও করতে এসেছিল তার পিশেমেশো, বন্ধুবান্ধব, অবান্ধব ও শত্রু কেউ তাকে তার এ সঙ্কল্পের জন্য সম্বর্ধনা করবার কোনও নমুনা দেখালে না, বরং প্রকাশ করলে যে, তারা তাকে নিবৃত্ত ক’রতে বদ্ধপরিকর। মনে হ’ল যে, সেজন্য তারা তাকে মারধর, চাই কি খুন পর্যন্তও হয় তো করতে পারেন। একজন তো প্রায় স্পষ্ট করেই বললে সে কথা। সে বললে, “এর জন্য এত সাধাসাধি কেন? সামান্য একখানা ঠ্যাং মটকে ভেঙ্গে দিলেই ত লেঠা চুকে যায়।”

এই দঙ্গলের গতিক সতিক দেখে প্রমোদ স্থির করলে যে এদের হাত থেকে পলায়নই একমাত্র বিধি। তাই সে তাদের বললে, “আচ্ছা একটু ভেবে দেখি—এখনও তো ক’দিন সময় আছে!”

কোনও মতে এদের হাত এড়িয়ে স্টেশনের বাইরে আসতেই তাকে এসে সম্ভাষণ করলেন শ্রীযুত বিদূষক!

"এই যে এসেছেন আপনি। আসুন, আপনার জন্যে গাড়ী নিয়ে এসেছি," ব'লে বিদূষক ওরফে বিধায়ক একখানা বুইক গাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

প্ল্যাটফরমে বিপরীত সম্ভাষণে প্রমোদের স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছিল, তাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সে বললে, "আমার জন্যে গাড়ী! আপনি ভুল করেছেন।"

হেসে বিদূষক মশায় বললেন, "ভুল করবো আমি আপনাকে? প্রমোদ ঘোষকে আমি চিনি না! —আসুন।"

আরও অবাক হয়ে প্রমোদ ভাবলে যা হক, তার আশা আছে। এটা বোধ হয় তার ভক্তদের অভিনন্দনের পূর্বরাগ, একটু গর্ব হল তার। কিন্তু তবু ফস্ ক'রে অতবড় ঝকঝকে গাড়ীতে খামখা চ'ড়ে বসতে তার কোথায় যেন খোঁচা লাগতে লাগলো।

সে হেসে বললে, "আমি মোটর চড়বো কি মশায়? আমার চব্বিশ বছরের পুরোনো বন্ধু শ্রীচরণের গাড়ী ছেড়ে? যখন নীচে থাকি মাটি ছুঁয়েই থাকি, আর উঠলে উঠি আকাশে—True to the kindred points of heaven and home."

হো হো ক'রে হেসে বিদূষক বললেন, "হা হা বেশ কবির মত কথা বলেছেন। কিন্তু আজকের দিনে আমি আপনাকে ভূমি স্পর্শ করতে দিতে পারিনে। গাড়ী চড়তে না চান কাঁধে ক'রে নেব আপনাকে।"

প্রমোদ দেখলে, ছাড়ান পাওয়া দায়। এ লোকটা বোধ হয় ভক্ত। খুব বেশী না হলেও, সাহিত্যিক হিসাবে প্রমোদ দু একজন ভক্তের পাল্লায়

পড়েছে। সে জানে যে তাদের কাছে শিরীষের আটা হার মানে, তারা একেবারে লেপটে জড়িয়ে থাকে।

তাই সে জিগ্‌গেস করলে, "কোথায় যেতে হবে আমায়?"

"আপনার সম্বর্ধনার জন্যে সামান্য একটু আয়োজন করা হয়েছে, কয়েকজন খ্যাতনামা লোক থাকবেন আর—"

যা ভেবেছে প্রমোদ তাই! সে খুসী হল, তবু সে বললে, "কিন্তু আমার যে এখন বাসায় গিয়েই বাজারে বের হতে হবে। তারপর মাত্র কটা দিন! এর ভিতর রাজ্যের কাজ প'ড়ে আছে; আমাকে মাপ করুন, সময় হবে না আমার।"

"মাত্র এক ঘণ্টা—অনেক আয়োজন করেছি। দয়া ক'রে বঞ্চিত করবেন না আমাদের। আর আপনার কাজ যা নিজে না করলে চলে, আমি ভার নিচ্ছি, সে সব ক'রে দেবো। চাই কি বিয়ে করতে চান তার জোগাড় পর্যন্ত," ব'লে বিদূষক হাসলেন।

প্রমোদ দেখলে, এ ভক্ত না হয়ে যায় না। আটার জোরেই বোঝা যায়, এর হাতে মুক্তি নেই। তাই সে সুড় সুড় ক'রে তার ছোট্ট সুটকেশ হাতে ক'রে সেই মস্ত মোটরে চেপে বসলো।

গাড়ী খানিক দূর গেলে বিদূষক বললেন, "দেখুন প্রমোদবাবু, অনেকে সন্দেহ ক'রছেন যে, আপনার এই যুদ্ধে যাবার সংকল্পের সঙ্গে আপনার 'নিঃশেষ' গল্পটার সম্পর্ক আছে।—মানে ব্যর্থ প্রণয়! কথাটা কি একদম মিথ্যে?"

প্রমোদ বললে, "দেখুন আমি ছিলাম ছোট্ট একটা দোকানী—চাল-চুলোর খুব বাহুল্য ছিল না। তার আবার প্রণয়ই বা হয় কোথা থেকে আর ব্যর্থই বা সে হয় কেমন ক'রে?"—বললে হেসে, কিন্তু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বিশ্বাসঘাতক হয়ে বেরিয়ে এলো।

"হাঁ দেখুন, আপনি গল্প লেখাটা কি একেবারে ছেড়ে দিলেন? 'নিঃশেষ' গল্পটায় আপনার যে ভয়ানক নাম হয়েছে, আমি ভাবছিলাম আপনার খান কয়েক বই পাবলিস করবো।"

"আপনি কি পাবলিশার?" জিগ্‌গেস করলে প্রমোদ।

"হই নি এখনও, কিন্তু সুযোগ পেলে হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে নেই তা বলতে পারি না।"

"কিন্তু আমার কাছে সে সুযোগ পাবেন না। আমার আর লেখবার ইচ্ছা নেই।"

"তার মানে 'নিঃশেষ' আপনার Parsifal. ঐ রকম শুনেছিলাম সব পাবলিশারদের কাছে। তাইতেই ঐ ব্যর্থ প্রণয়ের গুজবটা উঠেছে।"

"না ম'শায়, বাজে কথা। যুদ্ধ করবো, তার লিখবো কখন? তাই লিখবো না।"

হেসে বিদূষক বল্‌লে, "কিন্তু যুদ্ধ না ক'রে ঘরে ব'সে আরাম ক'রে লেখবার তো কোনও বাধা ছিল না আপনার।"

গাড়ীখানা সার্কুলার রোড দিয়ে সোজা দক্ষিণদিকে যেতে যেতে যখন পশ্চিমদিকের মোড় নিলে তখন তার গন্তব্য পথ সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে প্রমোদ বল্‌লে, "কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?"

"বেশী দূর নয়, ভবানীপুর।"

"মাপ করবেন, আমি সেখানে যাবনা। দক্ষিণ কলিকাতা থেকে জন্মের মত বিদায় নিয়ে এসেছি।"

বিদূষক একটু মুচকে হেসে বললেন, "দেখুন, আজ দশ বৎসর দক্ষিণ কলিকাতায় আছি, এটা এত ভয়ানক জায়গা ব'লে তো জানি না। আর আমার আশা আছে যে আপনিও যদি একে আর একটা

চান্স দেন তবে হয় তো আপনার কাছেও এটা আর তেমন ভয়ানক লাগবে না।”

প্রমোদ ব্যগ্র হয়ে বললে, “না, না—আমায় মাপ করুন আমি কিছুতেই—”

“ব্যস্ত হবেন না, ঠিক দক্ষিণ কলিকাতা একে না বল্‌লেও চলে, ল্যান্সডাউন রোডের মুখেই—এই তো এসে গেছি।”

এসে যখন পড়েছে তখন প্রমোদের নামতেই হ'ল। যেখানে নামলে সেটা বেশ বড় লোকের বাড়ি।

সেখানে নামতেই একটি ছোট মেয়ে তার গলায় মালা পরিয়ে দিলে—প্রমোদের মনে হ'ল যেন মেয়েটাকে সে চেনে।

তার পরে খাওয়া দাওয়া হ'ল।

রাত হ'য়ে যায় দেখে প্রমোদ চঞ্চল হয়ে উঠলো। কিন্তু তার পরে যা হল তাতে সে একেবারে হাঁপিয়ে উঠলো।

২০

বিধায়ক ব'লেছিলেন অভিনন্দন হবে।

কোথায় অভিনন্দন?

মালা পরান হ'ল, তাকে সম্মানের আসনে ব'সিয়ে খাওয়া দাওয়া হ'ল—কিন্তু ঐ পর্যন্ত।

দেশের রাজনীতিক মহলের কয়েকজন হোমরা-চোমরা এসেছিলেন এ ভোজে। তাঁরা খেতে খেতে যে আলোচনা ক'রলেন তাতে প্রমোদের মোটেই মনে হ'ল না যে তাঁরা প্রমোদকে অভিনন্দন ক'রতে এসেছেন।

হোমরা এবং চোমরাগণ ব'ললেন যে যুদ্ধে ইংরেজ হেরে একেবারে ছাতু হ'য়ে গেছে। ছাতু হ'য়েও তার এখনও অণু হ'য়ে যেতে বাকী আছে—কিন্তু সেও বেশীদিন নয়। হিটলারের ইংলণ্ড বিজয় হ'তে বড় জোড় পোনেরো বিশ দিন বাকী। বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গেই তাঁরা এ আলোচনা ক'রলেন।

স্বধু একটি লোক—সে না হোমরা না চোমরা—সে স্বধু এড়ো তর্ক ক'রতে লাগলো যে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে হারান হিট্‌লারের পক্ষে অসম্ভব।

১নং হোমরা ব'ল্লেন, "ব'য়ে গেছে সাম্রাজ্যের ইংরেজকে সাহায্য ক'রতে! এই দেখ না ক'টা দিন, দেখতে পাবে একে একে দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা প্রভৃতি সবাই আয়রার মত হাত গুটিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রবে—আর ভারতবর্ষও সে সুযোগ ছাড়বে না।"

২নং হোমরা ব'ল্লেন, "নমুনা তো দেখাই যাচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় Hertzog বড় কেও কেটা নয়, সে কি ব'লছে দেখেছ তো?"

না-হোমরা-না-চোমরা ব'ল্লেন, "সাম্রাজ্যের সবগুলি দেশ যদি একেবারে গুলিখোরে বোঝাই থাকে তবেই আপনারা যা ব'লছেন তাই হবে। কেন না এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে এ লড়াইয়ে যে স'রে দাঁড়াবে তার বেশীদিন স'রে দাঁড়াতে হবে না। ডেনমার্ক নরওয়ের মত তাকে হিটলারের কবলে প'ড়তে হবে। সবাই মিলে একজোট হ'য়ে হিটলারের প্রতিরোধ করাই প্রত্যেকের স্বাধীনতা রক্ষার একমাত্র উপায়!"

১নং চোমরা ব'ললেন, "স্বাধীনতা রক্ষা না দাসত্ব রক্ষা! বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিজমের চাইতে বড় পেষণ শক্তি আর আছে?"

"অন্ততঃ আর তিনটি আছে, হিট্‌লার, মুসোলিনী ও জাপান।"

২নং চোমরা ব'ল্লেন, "দেখছি দাসত্ব তোমার নেহাৎ মজ্জাগত! নইলে ভারতবাসী হ'য়ে ইংলণ্ডের পক্ষে ওকালতি!—যে ইংল্যাণ্ড প্রায় দুই শতাব্দী ভারতকে পদানত ক'রে রেখেছে। এত বড় শত্রুর নিপাত যদি হয় তবে ভারতবাসী খুসী না হ'য়ে পারে না।"

১নং হোমরা ব'ল্লেন, "নিশ্চয়, এই তো ভারতের স্বযোগ!—এখন যদি ভারতবর্ষ এ স্বযোগের সদ্ব্যবহার না ক'রে বৃটেনের সহায়তা ক'রতে যায় তবে এ স্বযোগ আর সে পাবে না।"

উত্তর হ'ল, "ভারত যে এতটা খাটো হ'য়ে গেছে সে কথা আমি মনে ক'রতে পারি না। শত্রুই যদি হয় ইংল্যাণ্ড তবু সে আজ বিপদে প'ড়েছে ব'লে উল্লাস ক'রবে, ভারত কি এতই নীচ। হাতী যদি পাঁকেই প'ড়ে থাকে তবে ব্যাঙ্ কি ছুঁচো ছাড়া কেউ তাকে পদাঘাত করবার লোভ ক'রবে না।—স্বযোগ ব'লছেন একে? কিসের স্বযোগ? নিজের পৌরুষ দেখিয়ে আত্মশক্তি বলে শত্রুকে পরাজয় করবার স্বযোগ খুঁজছেন না আপনারা, খুঁজছেন শত্রু পতিত হ'লে পিঠে গোপনে ছোরা বসিয়ে দেবার স্বযোগ। এতখানি ছোটলোক আশাকরি ভারত আজও হয় নি।"

তার কথা শুনে প্রথমে হোমরা ও তারপরে চোমরার দল একটা বিকট অনৈক্যতানে হেসে উঠলেন। খুব মুরুব্বীয়ানা ক'রে তাঁরা বোঝালেন যে পলিটিক্স জিনিষটা অত সহজ নয় এবং সামান্য ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে তাঁরা এই কথাই বোঝালেন যে এর সব গোপন অন্ধি-সন্ধির জ্ঞান কেবল তাঁদেরই একচেটিয়া। তারপর তাঁরা যুদ্ধের উদ্দেশ্য, গতি এবং তার সব গোপন চাল সম্বন্ধে সব কথা নিঃসন্দেহ সত্য ব'লে প্রকাশ ক'রতে লাগলেন, হিটলারের উদ্দেশ্য, অভিসন্ধি এবং তার চালের পর চাল বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা ক'রলেন।

শুনতে শুনতে প্রমোদের মনে হ'ল যে হিটলারের চাল যে কখন কি হবে, কোন দিকে কোন ধাক্কা কখন দেবে জার্ম্মানী, এ খবর পাবার জন্য ইংলণ্ডের মন্ত্রী সমাজ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ ক'রেও নিশ্চিত হ'তে পারছেন না। অথচ হোমরা ও চোমরার দল নিঃশেষে সে কথা জেনে ব'সে আছেন! কি ভুল চার্চ্চিলের—তিনি এদের ডেকে জিজ্ঞেস করেন না ?

এই সব কথাবার্ত্তা শুনে প্রমোদের মনটা ভারী উস্‌খুস্‌ ক'রছিল। কথায় কথায় তর্কের ইচ্ছা অদম্য হ'য়ে উঠছিল—কিন্তু এতগুলি গণ্যমান্য লোকের কথার উপর কথা কইবার ধৃষ্টতা তার ছিল না। তাই মুখ চোখ লাল ক'রে স্বধু শুনছিল সেই হোমরা চোমরাদের কথা—স্বধু উৎসুক প্রশংসার সহিত সে চেয়ে দেখছিল মাঝে মাঝে সেই নগণ্যটির দিকে যে সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর মত এদের সঙ্গে তর্ক সংগ্রাম ক'রছিল।

কিন্তু বেশীক্ষণ প্রমোদ এ নির্লিপ্তভাব রক্ষা ক'রতে পারলে না। খাওয়া দাওয়ার পর হোমরা চোমরার দল তাকে নিয়ে প'ড়লেন—এক সঙ্গে।

১নং হোমরা ব'ললেন, "আপনার অসামান্য প্রতিভা আছে"—১নং চোমরা ব'ল্লেন "আপনার সাহস ও শৌর্য অতুলনীয়"—২নং হোমরা ব'ল্লেন, "বিশেষতঃ আপনি যুবক"—২নং চোমরা ব'ল্লেন, "আপনি দেশকে নিশ্চয়ই ভালবাসেন"—৩নং হোমরা বল্লেন, "সমগ্র ভারতের পক্ষে কংগ্রেস সিদ্ধান্ত ক'রেছেন যে ভারতবাসী স্বাধীনতা না পেলে ইংরাজকে কোনও সাহায্য ক'রবে না"—৩নং চোমরা ব'ল্লেন, "এ অবস্থায় আপনার মত যুবকের কি উচিত নয় কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা ?"

প্রমোদ হেসে ব'ল্লে, "নিশ্চয় নয়। এই শিক্ষাই তো আপনাদের নেতা আমাদের দিয়েছেন!"

"এই শিক্ষা! কে দিয়েছেন?"

"মহাত্মা গান্ধী। একবার নয় বহুবার তিনি বাক্যে ও কার্যে দেখিয়েছেন যে যার সঙ্গে তোমার মতের মিল নেই তার সঙ্গে একমাত্র কর্তব্য—অসহযোগ!"

"তার মানে কংগ্রেসের মতের সঙ্গে আপনার মিল নেই—কেন জানতে পারি?" জিজ্ঞেস ক'রলেন ১নং হোমরা।

"ঠিক ব'লতে পারবো না। কেন না গরমিলটা খোলসা ক'রে বোঝাতে গেলে জানা দরকার যে কংগ্রেসের ঠিক মতটা কি? সেইটেই এ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না আমি।"

১নং চোমরা ব'ললেন, "কেন? সে মত তো কংগ্রেসের রেজোল্যুশনে খুব স্পষ্ট ভাষায়ই লেখা হ'য়েছে।"

"মাপ ক'রবেন, তাতে স্পষ্ট ভাষায় স্বধু এইটুকুই বলা হ'য়েছে যে আমরা যুদ্ধ ক'রবো না। কেন যে ক'রবো না সেটা মোটেই স্পষ্ট নয়। ব'লছেন ভারতকে স্বাধীন ক'রে দেবার প্রতিশ্রুতি না দিলে যুদ্ধ ক'রবো না। আবার ব'লছেন যুদ্ধ হিংসা—কংগ্রেস অহিংস। ব'লছেন হিটলার যদি এসে ভারতবর্ষ অধিকার ক'রতে চায়, আমাদের যথাসর্ব্বস্ব নিতে চায়, তাকে পথ ছেড়ে দিতে হবে। ব'লছেন চেকোশ্লোভাকিয়াকে রক্ষা করবার জন্য যুদ্ধ না ক'রে ইংরাজ ঘোর অন্যায় ক'রেছেন। আবার সেই চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোলাণ্ডের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ক'রেছেন ব'লে ইংরেজ হ'য়েছেন ইম্পিরিয়ালিষ্ট। এ গোলকধাঁধাঁর মধ্যে আমি পথ খুঁজে পাই না।"

২নং হোমরা ব'ল্লেন, "প্রত্যেকে নিজে বুঝে পথ খুঁজে পাবে তা'

হ'তেই পারে না। কংগ্রেসে দেশের সমবেত হিতবুদ্ধির হাতে পথ খোঁজবার ভার দিয়ে, প্রত্যেক দেশবাসীর কর্তব্য তাঁদের সিদ্ধান্ত নির্বিচারে মেনে চলা।"

"তার মানে আপনারা সমস্ত দেশটাকে শূদ্র—গোলাম ক'রে রাখতে চান—মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণের পদানত দাস। এইখানেই আপনাদের সঙ্গে, কংগ্রেসের সঙ্গে, আমার প্রথম গরমিল—দাসত্ব ক'রতে আমি রাজী নই।"

২নং চোমরা ব'ল্লেন, "তার মানে দাসত্বই ক'রবেন, কিন্তু গান্ধীজীর নয়—ইংরেজের।"

প্রমোদের চোখের ভিতর হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠলো, সে ব'ল্লে, "দেখুন ছোট মুখে বড় কথা কইবেন না। জানেন আপনারা এবং আপনাদের মত যারা যুদ্ধ ক'রতে পরাঙ্মুখ তারা কি?—তারা কাপুরুষ। যুদ্ধ ক'রবেন না আপনারা কিছুতেই। আপনাদের ঘর বাড়ী উজাড় ক'রে নিয়ে গেলেও লড়াই করবার মত সাহস আপনাদের নেই—সেই কাপুরুষতা ঢাকবার জন্য আপনারা রোজ রোজ নতুন নতুন গালভরা ওজুহাত খুঁজছেন হাত গুটিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাকবার। মনের তলায় হাঁতড়ে দেখবার শক্তি থাকে দেখুন, এ ছাড়া আর কোনও হেতু নেই আপনাদের নিষ্ক্রিয়তার! আপনাদের প্রথম অজুহাত, ভারতকে স্বাধীন ক'রে দিচ্ছে না ইংরেজ। তার জবাব, স্বাধীনতা অর্জন ক'রতে হয়, হাত পেতে নেবার জিনিষ এ নয়। আজ যদি আপনারা অগ্রসর হ'য়ে ব'লতেন ভারতের সমস্ত শক্তি সংহত ক'রে যুদ্ধ ক'রবার দায়িত্ব আমরা নেব, আর নিতেন যদি, তবে যুদ্ধের পর স্বাধীনতা দেবার জন্য আবেদন ক'রতে হ'ত না, স্বাধীনতা স্বীকার করা ছাড়া ইংলণ্ডের আর গতি থাকতো না।

দ্বিতীয় ওজুহাত—এটা নাকি ইম্পিরিয়ালিষ্ট যুদ্ধ—ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য বিস্তার এর লক্ষ্য। সে সন্দেহ যদি হয় তবে ইংলণ্ডের আজকের একটা মুখের কথায় সেটা মিটবে? মুখের কথা অনেক সময় মুখেই থাকে। কিন্তু আজ যদি ভারত একটা প্রচণ্ড শক্তি সংহত ক'রে নিয়ে এ যুদ্ধ ক'রতে যায় তবে যুদ্ধের শেষে যে শান্তির বৈঠক হবে, তাতে ভারত সেই সংহত শক্তির জোরে জোর গলায় ব'লতে পারবে—সাম্রাজ্য বিস্তার চ'লবে না, সমগ্র বিশ্বে ন্যায়ের অধিকার স্বাধীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত ক'রতে হবে।—এই যদি আপনাদের মনের কথা হ'ত তবে এর উপযুক্ত উপায় হ'ত সমগ্র শক্তি নিয়ে যুদ্ধ ক'রতে অগ্রসর হওয়া। এগুলো আপনাদের মনের কথা নয়, তাই আপনাদের মত ও উপায়ের কল্পনায় কোনও সামঞ্জস্য নেই।"

একটি চোমরা খুব গরম হ'য়ে ব'ল্লেন, "তুমি যা' ব'ল্লে এক কথায় তার নাম ডেঁপোমি।"

আর একটি হোমরা ঠাণ্ডাভাবে ব'ল্লেন, "থাম, আচ্ছা এ কথা তুমি স্বীকার কর যে ইংরাজ আমাদের শত্রু?"

"এককথায় এর জবাব দেওয়া যায় না। ইংরেজ আমাদের শত্রুতাও করেছে, বন্ধুর কাজও ক'রেছে।"

"কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা হরণ ক'রে ইংরাজ আমাদের পরাধীন ক'রে রেখেছে—শত আবেদন নিবেদনেও স্বাধীনতা দেয়নি আমাদের—তার নিজের গৌরব নিজের সমৃদ্ধির জন্য আমাদের সমস্ত জাতির স্বার্থ নিষ্পেষিত ক'রেছে।"

"মেনেই না হয় নিলাম সে কথা, কিন্তু তার বিচারের সময় এখন নয়।"

"এখনই শ্রেষ্ঠ সময়—এখন যদি না হয় তবে কোনও দিন সে সময় হবে না।"

বিরক্ত হ'য়ে প্রমোদ ব'লে উঠলো, "আমি অনেক ধৃষ্টতা ক'রে ফেলেছি, মাপ ক'রবেন আপনারা। হয়তো আপনারা যা ব'লেছেন তাই সত্যি, এ আমার ডেঁপোমি! আমি পলিটিক্স ভাল বুঝি না। এখন আমাকে বিদায় দিন আমার অনেক কাজ আছে।"

"কিন্তু সে কাজ যে অকাজ—"

"মাপ ক'রবেন। পলিটিক্স হয়তো আমি কিছু বুঝি না। হয়তো একথা সত্যি যে ইংলণ্ড আমাদের মহাশত্রু। কিন্তু সেই শত্রু এখন বিপন্ন হ'য়ে আমার মনুষ্যত্বের কাছে সাহায্যের আবেদন ক'রেছে। আর্তের এ আবেদন পেয়ে শক্তি থাকতে নিষ্কর্মা হ'য়ে ব'সে থাকা পলিটিক্সে যত বড় ধর্মই হোক তাতে আমার মনুষ্যত্বে আঘাত লাগে। আর্তের সহায়তা করা যে অকাজ, যুক্তির জাহাজ আনলেও আপনারা আমাকে তা বোঝাতে পারবেন না।"

বিধায়ক এতক্ষণে ব'ল্লেন, "কিছুতেই আপনার এ প্রতিজ্ঞা ট'লবে না? ভেবে দেখুন, আপনার মূল্যবান জীবন—"

হাত জোড় ক'রে প্রমোদ ব'ল্লে, "মাপ ক'রবেন, বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে, অনেক কাজ করবার আছে, আমি যাই।"

বিধায়ক তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চ'ল্লেন। যাবার পথে পাশের ঘরে এসে প্রমোদ দেখলে—প্রহেলিকা!

২১

প্রহেলিকার উপর তার ক্রোধের সীমা ছিল না। কিন্তু তবু তাকে হঠাৎ সামনে দেখে প্রমোদ চমকে উঠলো। তার সমস্ত শরীর প্লাবিত ক'রে ব'য়ে গেল একটা অযথা উল্লাসের ঢেউ।

প্রহেলিকা প্রশান্ত গম্ভীর মুখে এসে তার হাত ধ'রে টেনে ব'ল্লে, "বস্থন।"

একখানা সোফার উপর দুজনে ব'সলো।

অনেকক্ষণ কেউ কোনও কথা ব'ললে না।

শেষে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে প্রহেলিকা ব'ল্লে, "প্রমোদ বাবু—" আর কোনও কথা সে ব'লতে পারলে না।

তার হাতখানা প্রহেলিকা ধ'রেই ছিল। থর্‌থর্ ক'রে কাঁপছিল প্রহেলিকার হাত। সে কম্পনের স্পর্শে প্রমোদের মনের ভিতর পুলকের যে হিল্লোল ব'য়ে গেল তাতে ধুয়ে গেল তার সকল বিরাগ।

আবার অনেক কষ্টে প্রহেলিকা ব'ল্লে, "আপনার যুদ্ধে যাওয়া হবে না।"

প্রমোদ ব'ল্লে, "দেখুন, মাপ ক'রবেন—"

প্রহেলিকা আবেগপূর্ণ কণ্ঠে ব'ল্লে, "আমি যেতে দেবো না আপনাকে।"

অমনি তার চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে জলের স্রোত ব'য়ে গেল। কিছুতেই আটকাতে পারলে না সে চোখের জল।

প্রমোদ একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। সে অসহায় ভাবে চাইলে বিধায়কের দিকে—কিন্তু, কোথায় বিধায়ক?—তিনি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন।

প্রমোদ ব'ল্লে স্থধু, "মাপ ক'রবেন।"

চোখের জল মুছে প্রহেলিকা ব'ল্লে, "কেন যাবেন? আমার জন্যে? আমি—আমাকে যা' ভেবেছেন তা নই আমি—আমি স্থচরিতা নই।"

প্রমোদ ব্যস্ত হ'য়ে ব'ল্লে, "দেখুন, আমাকে মিছে অপরাধী ক'রছেন, আমি যুদ্ধে যাচ্ছি স্থধু গৌরবের লোভে।"

"আমি এত বোকা নই যে ঐ কথায় আপনি আমায় ভোলাবেন। বেশ, গৌরবের লোভ যদি থাকে, আমার লোভে সে লোভ আপনার ছাড়তে হবে।"

প্রমোদ একটু হেসে ব'ল্লে, "সে লোভ ক'রে লাভ কি ? শেয়ালের আঙুরের লোভ !"

"কিন্তু আঙুর আজ শেয়ালের পায়ের তলায়, দয়া ক'রে কুড়িয়ে নিন স্থধু।"

একটু হেসে প্রমোদ ব'ল্লে, "শেয়ালের ? না সিংহের—হর্য্যক্ষ বাঁড়ুয্যের ?"

একটা কৌতুকের হাসি খেলে গেল প্রহেলিকার চোখে। তার পর মুখখানা ভার ক'রে সে ব'সে রইলো কিছুক্ষণ। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে প'ড়লো।

তার পর সে ব'ল্লে, "আপনি বিশ্বাস করেন যে মাষ্টার মশায়কে আমি ভালবাসি ?"

"ভালবাসেন কিনা সে আপনার অন্তর জানে। কিন্তু পরশু তাকে বিয়ে ক'রছেন তো ?"

"পরশু আমি বিয়ে ক'রছি—কিন্তু তাকে নয়—যাকে বিয়ে ক'রবো তাকে আপনি খুব চেনেন।"

"বাড়ুজ্যে নয় ? তবে কি নিখিলেশ ?"

ঘাড় নেড়ে প্রহেলিকা অসম্মতি প্রকাশ ক'রলে।

"তবে কে ?"

"সে এই ঘরেই ব'সে আছে" ব'লে অপাঙ্গে প্রহেলিকা কটাক্ষ ক'রলে।

প্রথম আঘাতে এ কথায় প্রমোদের হৃদয় উল্লাসে নেচে উঠলো। তার পর সে দমে গেল। কি ব'লবে সে তা ভেবে পেলো না।

অনেকক্ষণ পরে সে ব'ল্লে, "অসম্ভব।"

"কেন অসম্ভব? বিশ্বাস হয় না যে আমি আপনাকে ভালবাসি। কেন? কি অপরাধ ক'রেছি আমি?"

ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে প্রমোদ দাঁড়িয়ে উঠলো। প্রহেলিকা তার হাত ধ'রে চেপে তাকে বসালে।

প্রমোদ আবার ব'ল্লে, "অসম্ভব, এখন অসম্ভব।"

"কেন?"

"মরণব্রতের ব্রতী আমি, আমি আপনার অদৃষ্ট আমার সঙ্গে জড়াতে পারি না।"

"সে ব্রত কি আমার জন্য ত্যাগ করতে পারেন না। ভাল কি বাসেন না আপনি আমায়?"

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে প্রমোদ ব'ল্লে, "কত যে ভালবাসি তোমায় তা বলবার অধিকার আর আমার নেই। তোমাকে ভালবাসার স্পর্দ্ধা রাখি ব'লেই আমি নিজেকে কলঙ্কিত ক'রে সে ভালবাসার অযোগ্য ক'রতে পারিনে।"

"আমার ভালবাসা তবে ব্যর্থ হবে?"

"ভাল যদি বাস আমাকে তবে কি তুমি আমার গৌরবের পথে অন্তরায় হবে? মনুষ্যত্বের দর্প ক'রে পা বাড়িয়ে মরণের ভয়ে পিছিয়ে আসবো, আর সমস্ত পৃথিবী আমায় ধিক্কার দেবে এই কি তুমি চাইতে পার, যদি আমায় ভালবাস?"

এ কথায় প্রহেলিকার মুখ বন্ধ হ'ল। অনেকক্ষণ সে নীরবে উর্ধ্বদৃষ্টি হ'য়ে ব'সে রইলো স্থধু। অশ্রুধারায় আবার ভেসে গেল মুখ।

প্রমোদ ব'ল্লে, "দেবি, এতখানি সৌভাগ্য যদি হ'য়েছে আমার তবে —তবে বাধা দিওনা আমায়, প্রসন্ন মনে আমাকে বিদায় দেও।"

গম্ভীর মুখে প্রহেলিকা ব'ল্লে, "বাধা দেবো না আর। কিন্তু বিদায় এখন নয়। পরশু, বিয়ে হ'য়ে গেলে তার পর বিদায়!"

চমকিত হ'য়ে প্রমোদ ব'ল্লে, "পরশু বিয়ে? কি ব'লছো তুমি? এ যে একেবারেই অসম্ভব।"

"কিছু অসম্ভব নয়। বিয়ের জোগাড় সব ঠিক আছে।"

ব্যগ্রভাবে প্রমোদ ব'ল্লে, "সে কথা নয় দেবি, আমার পক্ষে এখন তোমার অদৃষ্ট আমার সঙ্গে জড়ান—একেবারে অসম্ভব।"

"কেন? জীবনে মরণে তোমার গৌরবের ভাগ পাব আমি, এই ভিক্ষা তুমি দিতে পার না, তুমি এত বড় কৃপণ?"

তার পর প্রমোদের হাতখানা তার মুখের কাছে টেনে নিয়ে তাতে একটা চুম্বন দিয়ে প্রহেলিকা ব'ল্লে, "আর কোনও কথা নয়। আমি তোমাকে নিয়ে নিলাম। Signed, sealed and delivered!"

ব'লে প্রহেলিকা মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেল। প্রমোদের হাতে চুম্বনের যে সিক্ত স্পর্শ তখনও লেগেছিল তার পাশে প'ড়েছিল দুফোঁটা চোখের জল।

প্রমোদ স্তব্ধ হ'য়ে সেই দিকে মোহমুগ্ধের মত চেয়ে শুধু ব'সে রইলো অনেকক্ষণ।

তার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে সে তার মেসে চ'লে গেল।

২২

প্রমোদ চ'লে যেতেই বিধায়ক প্রহেলিকার কাছে গিয়ে উদ্বিগ্নকণ্ঠে ব'ল্লেন, "পলি, বড় গোলযোগ! কি যে ব'লবো তোমায় বুঝতে পারছি না। ভারী মুস্কিল।"

প্রহেলিকা ব্যঙ্গ ক'রে মুখ ভার ক'রে ব'ল্লে, "বাস্তবিক ভারী মুস্কিল। এমন কখনও হয়নি জগতে কারও! কোনও উপায়ই নেই। কি ব'লেন?"

"না, না, তামাসা নয় পলি, ব্যাপার সত্যিই গুরুতর। ভারী বিপদ। কিন্তু কথাটা তোমার কাছে—"

হাত জোড় ক'রে প্রহেলিকা ব'ল্লে, "এখন দয়া ক'রে গৌরচন্দ্রিকা ছেড়ে, চোখ মুখ বুজে ব'লে ফেলুন না কথাটা তবেই তো লেঠা চুকে যায়।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিধায়ক ব'ল্লেন, "এইটে দেখ।"

একখানা চিঠি।—বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র!

প'ড়তে প'ড়তে প্রহেলিকার মুখ চোখ লাল হ'য়ে উঠলো।

অনেকক্ষণ সে কোনও কথা কইলে না। তার মুখের সব শিরাগুলো ফুলে ঢোল হয়ে উঠলো।

তার পর প্রহেলিকা ব'ল্লে, "চলুন।"

বিধায়ক মাথা চুলকে ব'ল্লেন, "কোথায়?"

"আমি যেখানে নিয়ে যাব।"

* * *

এ দিকে প্রহেলিকার কাছে বিদায় পেয়ে বাসায় ফিরবার পথে, উল্লাস, সংশয়, বেদনা, প্রেম, শঙ্কা, সবাই মিলে প্রমোদের মনটাকে নিয়ে

ফুটবল খেলতে লাগলো। সেই সব আঘাতে টাল খেতে খেতে সে মাতালের মত হ'য়ে পৌছল গিয়ে তার শ্যামবাজারের সীমার সেই মেসে। বিধায়কের মোটর তাকে পৌঁছে দিলে।

প্রমোদ দেখে চ'মকে উঠলো যে তার ঘর বোঝাই লোক, তাদের কেন্দ্রস্থলে ব'সে আছেন প্রমোদের বড়দাদা, সুবোধ।

সুবোধ থাকেন পেশাবরে; সেখানে মিলিটারী বিভাগে চাকরী করেন।—আজ সাত আট বৎসর প্রমোদের তাঁর সঙ্গে দেখা নেই। হঠাৎ এই যুদ্ধের হাঙ্গামার মাঝে তিনি ছুটি নিয়ে এসে পৌঁছেছেন দেখে প্রমোদ ভয়ানক অবাক হ'য়ে গেল। শুনতে পেলো তিনি এইমাত্র এসেছেন।

তাঁর পাশেই তার সেই পিশে মশাইকে দেখে প্রমোদ আরও প্রমাদ গণলে।

ব্যাপারটা ক্রমে বোঝা গেল।

মাস খানেক আগে সুবোধের এক বন্ধু—তিনিও প্রবাসী—তাঁর মেয়ের সঙ্গে প্রমোদের বিয়ের প্রস্তাব ক'রে চিঠি লিখেছিলেন।

সুবোধ মেয়েটি দেখে খুসী হয়ে ১৫ই ফাল্গুন বিয়ে স্থির ক'রে প্রমোদকে চিঠি লিখে জানাল, আর প্রমোদকে সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রতে বল্লে। সে চিঠি প্রমোদের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে শেষে ডেড লেটার আফিসে বিশ্রাম ক'রছে।

এদিকে সুবোধের বন্ধু যোগেন্দ্র ছুটি নিয়ে ক'লকাতায় এসে বিয়ের আয়োজন সম্পূর্ণ ক'রছেন।

সুবোধ এখানে এসে দেখেন বিপরীত কাণ্ড!

তিনি জোর ক'রে ব'ল্লেন, "ও সব হবে না। যুদ্ধে যাওয়া হ'তেই পারে না।"

প্রমোদ সব কথা শুনে ব'ল্লে, "আপনি আমাকে না জানিয়ে কেন এতটা ক'রতে গেলেন ?"

"শোন কথা! তিনখানা চিঠি লিখলাম তোমায়, তবু জানালাম না!"

"কই আমি তো কিছুই পাই নি!"

"সে তো আমার দোষ নয়।—আর যাক গে দোষ হোক বা না হ'ক, বুঝতেই তো পারছ, এখন আর উপায় নেই। যোগেন এতগুলো খরচ ক'রে এখানে এসে জোগাড় ক'রেছে—"

"তাঁকে বলুন, আমি যুদ্ধে যাচ্ছি, কাজেই—"

"আরে সেই কথা শুনেই তো সে বেচারা এসে কেঁদে প'ড়েছিল আমার কাছে। আমি তাকে ব'লে দিলাম যে তোমার যাওয়া কিছুতেই হবে না, তবে সে স্বস্থির হ'য়ে বাড়ী গেছে।—কাজেই বুঝতে পারছ— আর এ না হ'লে তার জাত যায়। বুঝতে পারছ তো ?"

দন্তে অধর দংশন ক'রে প্রমোদ অনেকক্ষণ ভেবে ব'ললে, "তাঁরা কোথায় আছেন ?"

স্নবোধ ঠিকানা ব'ললেন।

"তা হ'লে আমি একবার গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা ক'য়ে আসি।"

"কি ব'লবে শুনি ?"

"আমি নিজে তাঁদের কথাটা শুনে ভেবে দেখতে চাই।"

স্নবোধ প্রথমে তাতে আপত্তি ক'রলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পিশে মশায়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ব'ললেন, "বেশ, তাই যাও।"

আবার বের হ'ল প্রমোদ।

যোগেন বাবুকে প্রমোদ ব'ললে, "দেখুন, অজ্ঞানতঃ আমি আপনার কাছে অপরাধী হ'য়ে গেছি। দাদা যে সব চিঠি লিখেছিলেন তা'

আমি পাই নি। পেলে আমি তখনি টেলিগ্রাম ক'রে আপনাকে জানাতাম। যা' হ'য়ে গেছে তার আর চারা নেই। আপনি আমাকে ক্ষমা ক'রবেন।"

যোগেন বাবু ব'ললেন, "এ তো স্বধু ক্ষমা করবার কথা নয় বাবাজী। আমি সেই লাহোর থেকে এসেছি। বিয়ের আয়োজন সব ঠিক। হাজার হাজার টাকা খরচ হ'য়ে গেছে।—তা ছাড়া, কাল মেয়ের বিয়ে না হ'লে তো জাত যাবে।"

"কিন্তু, এ সব কথার চেয়ে বড় কথা হ'চ্ছে আপনার মেয়ের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কথা। আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। দাদা আপনাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে আমার যাওয়া হবে না। সেটা একেবারেই অসম্ভব। আমার জীবন মরণ নিয়ে হবে জুয়া খেলা—এ অবস্থায় আপনি আপনার মেয়েকে কখনই আমার হাতে দিতে পারেন না। তা' যদি না হ'ত তবে আমি দাদাকে আপনার কাছে মিথ্যাবাদী ক'রতাম না।"

"দেখ বাবাজী, আমিও তাই ভেবেই তোমার দাদাকে ধ'রেছিলাম। কিন্তু আমার মেয়ে ব'ললে কি জান? ব'ললে 'বাঁচা মরা অদৃষ্টের কথা, আমার সিঁদুরের জোর থাকে তবে যুদ্ধে গিয়ে উনি স্বধু বেঁচে থাকবেন না, গৌরবে মণ্ডিত হবেন। এ তুচ্ছ কথার জন্যে আপনি বিয়ে ভাঙ্গবেন না।' দেখতে পেলাম এতে ভয় পাবে কি সে, তুমি যুদ্ধে পাইলট হ'য়ে যাচ্ছ ভেবে তার ছাতি যেন ফুলে উঠেছে গর্বে। আজকালকার মেয়ে তাতে পাঞ্জাবে মানুষ হ'য়েছে, ওদের তেজই আলাদা। আমি ভাবলাম, ঠিকই ব'লেছে মেয়ে, ও নিয়ে আর কোন আপত্তি ক'রবো না।"

আকাশ থেকে যেন প্রমোদ ধপ্ ক'রে গভীর গর্তে প'ড়ে গেল।

এ বলে কী? বাপ না কষাই? যে ছেলে ম'রতে চ'লেছে তার হাতে মেয়ে দিতে চায়।

আর মেয়েটার নেকামী দেখ! গর্ব হ’য়েছে! স্রেফ রোমাণ্টিক বাঁদরামী।

যুদ্ধে গেলে যোগেন বাবু বিয়ে দেবেন না দাদার কথায় এই আশ্বাস পেয়ে প্রমোদ নিশ্চিন্ত হ’য়ে এসেছিল যে এই চালে বাজীমাৎ ক’রে সে দুই কূল বাঁচিয়ে যাবে। দেখতে পেলে মাৎ হ’য়ে গেল সে নিজে। এর পরে আর এক হাত খেলবার সম্বল তার নেই!

সে একেবারে ব’সে প’ড়লো।

একেবারে ন্যাতার মত হ’য়ে সে মেসে ফিরে গেল।

তখন সবাই ঘুমিয়ে প’ড়েছে। প্রমোদ ধপ ক’রে মেঝের উপর ব’সে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলো।

উপায় নেই তার, কোনও উপায় নেই!

বিয়ে ক’রতেই হবে।

প্রহেলিকা—তার স্বপ্নের সুধা, জাগ্রতের আশা—হাতে পেয়ে তাকে ছেড়ে দিতে হবে।

ভাবতে প্রমোদের মনটা দুমড়ে মুচড়ে ভেঙ্গে গেল!

প্রহেলিকা! কি অপূর্ব্ব, মহীয়সী সে নারী। প্রমোদ যুদ্ধে যাবে জেনেও দেবীর মত সে তার জীবনমরণের সঙ্গিনী, গৌরবের ভাগিনী হ’তে এসেছে। মৃত্যুকে সামনে ক’রে হাসিমুখে তাকে বরণ ক’রতে চায়।

কী সুগভীর এ প্রেম! কি অত্যুচ্চ এ চরিত্র!

যোগেন বাবুর মেয়ের বেলায় ঠিক এইটাই যে সে রোমাণ্টিক বাঁদরামী ভেবেছে সে কথা তার মনে হ’ল না।

তা’ ছাড়া সে আর এ? প্রহেলিকার কাছে ঐ মেয়েটা!

অনেকক্ষণ হতাশ হৃদয়ে ব'সে থেকে বাতি জেলে সে প্রহেলিকাকে একখানা চিঠি লিখলে।

লিখেই গেল সে। পাতার পর পাতা ভ'রে গেল—একখানা মোটা রাইটিং প্যাড্ নিঃশেষ হ'য়ে গেল।

তার হৃদয়ের সমস্ত অশ্রুসাগর সে ঢেলে দিলে সেই চিঠির ভিতর। তার প্রাণের সব পরদা খুলে সে তার গভীর প্রেম উন্মুক্ত ক'রে দেখাল—সে প্রেমের ইতিহাসে প্রতিদিনের প্রতি তুচ্ছ ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ ক'রে আগুনের ভাষায় লিখে গেল।

প্রত্যূষের প্রথম কাক যখন একটা সংশয়পূর্ণ ডাক ছাড়লে, তখন চিঠিখানা একটা বড় খামে পুরে সে বেরিয়ে গেল। ডাকবাক্সে চিঠি ফেলে এসে প্রমোদ বিবাহের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে ব'সলো বলিদানের পাঁঠার মত। স্বধু বলির পাঁঠা যায় অজ্ঞানে, প্রমোদ হাড়িকাঠের দিকে চ'লেছে সজ্ঞানে।

২৩

১৫ই ফাল্গুন।

প্রহেলিকার বাড়িতে জোর সানাই বাজতে লাগলো ভোর বেলা থেকে। মেরাপ উঠলো, ইলেক্ট্রিক লাইটের মালা জ্বলে উঠলো, লোকজনের আনাগোনায় বাড়ি সরগরম হ'য়ে উঠলো, বাড়ির লোকের গলা ভাঙলো, ছাদের উপর ভিয়েন বসলো, ঝুড়ি ঝুড়ি লুচি সন্দেশ ও হাঁড়ি হাঁড়ি দই যথানিয়মে গোপনে স্থানান্তরিত হ'ল, রাজ্যের লোক চুরি ক'রে ভাঁড়িয়ে নেমতন্ন খেয়ে গেল—ক'লকাতার বিয়ের আনুষঙ্গিক সব অঙ্গই যথানিয়মে হ'ল।

গোধূলি লগ্নে বিয়ে। বেলা থাকতেই শ্রীবিলাস সদলবলে এসে হাজির।

তার মনটা একটু উদ্বিগ্ন। ঠিক এই সময় আর এক বাড়িতে শশির যাবার কথা তার স্থলবর্ত্তী হ'য়ে বিয়ে করতে। সেখানে ব্যাপারটা ঠিক কি রকম দাঁড়াল সে সম্বন্ধে কাল থেকে কোনও খবর না পাওয়ায় তার মনে খানিকটা সন্দেহ ও প্রচুর আতঙ্ক ছিল। তাই সেখানকার খবর পাবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে সে প্রতিনিয়তই এদিক ওদিক চাইছিল।

বিয়ে হ'তে থাকলো। সেদিকে সে মোটেই মনোযোগ দিতে পারলে না। কি কতকগুলো মন্ত্র পড়া হ'ল, ফুল চন্দন, মালাটালা নিয়ে কি সব হ'ল। কতকগুলো লোক বোধ হয় ঘুরপাক খেলে। একবার বোধ হয় মেয়ের মুখ খোলা হ'ল, কিছুই তার খেয়াল হ'ল না। সে বার বার খোঁজ করতে লাগলো তারিণী এসেছে কি না।

বিয়ের সর্বাঙ্গ যখন সম্পূর্ণ হ'য়ে গেল তখন বাসর ঘরে যাবার পথে তারিণী এসে তার কানে কানে ব'লে গেল, সব মিটে গেছে। প্রথমে মেয়ের বাপ একটু গোলমাল করেছিলেন, কিন্তু শশির পরিচয় পেয়ে আর কিছু বলেন নি। পাঁচ হাজার টাকার নোট তারিণী শশির কাছ থেকে নিয়ে এসেছে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে শ্রীবিলাস, বিশেষ ক'রে এই শেষ কথায়। এতক্ষণে তার কুঞ্চিত ভ্রূযুগ সোজা হ'লো, ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠলো।

তারিণী তার কানে কানে বল্‌লে, "কিন্তু ঠ'কেছ দাদা! আমি বউ দেখে এসেছি, খাসা দেখতে। এ বউদির চেয়ে ভাল। আর যৌতুক যা দিয়েছে পঁচিশ হাজারের কম নয়।"

অ্যাঁ! বলে কি? শ্রীবিলাস একেবারে যেন স্বর্গ থেকে আছাড় খেয়ে পড়লো।

লোকসানের উপর লোকসান। একে তো সুন্দরী স্ত্রী হাতছাড়া হ'ল তার উপর নগদ পাঁচ হাজার টাকা। এখানে, শেষে যেচে বিয়ে করেছে ব'লে এঁরা নগদ টাকা কিছুই দেন নি, গয়না, দান যা দিয়েছেন বড় জোর হাজার চারেক টাকা। কি দুর্মতি তার হয়েছিল! যাক গে—

বাসর ঘরে এসে শালী শালাজরা ঘিরে ধ'রে তাকে যথোচিত নাকাল ক'রে শেষে ক'নের মুখের ঘোমটা খুলে ব'ললে, "ওগো চাও, একবার চেয়ে দেখ তোমার এত সাধনার ধন!"

দেখলে চেয়ে শ্রীবিলাস, একটু অপ্রসন্ন মুখেই। তারপর চোখ দুটো ডেলা ডেলা ক'রে মুখের কাছে নিয়ে দেখলে, দেখে সে ভিরমি খেয়ে প'ড়লো।

এ কে?—প্রহেলিকা তো নয়।

শ্রীবিলাস দাঁড়িয়ে উঠলো, "জুচ্চুরী, জুচ্চুরী, স্রেফ জুচ্চুরী। Cheating case করবো।" ব'লে সে চীৎকার ক'রে উঠলো।

তার রকম সকম দেখে মেয়ের দল টেনে ছুট মারলে, জামাই পাগল হ'য়ে গেছে স্থির ক'রে। ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে মেয়ের বাপ ভাইরা ছুটে এলো।

"কি হে কি ব্যাপার কি?" বল্লে বেচু চৌধুরী।

"ব্যাপার জুচ্চুরী! ফৌজদারী করবো, এ মেয়ের সঙ্গে তো আমার বিয়ের কথা হয় নি।"

"কী রকম" তেড়ে উঠলে বেচু চৌধুরী, "চোয়াড় শালা! এ মেয়ে নয় তো কোন্ মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল রে শালা?"

গোলমাল দেখে বরযাত্রীরাও এলেন।

খুড়ো বল্‌লেন, "কি হয়েছে? কি হয়েছে?"

বেচু ব'ললে, "শালার কথা শুনুন। যেচে এসে বিয়ে ক'রলে, মেয়ে দেখলে না, এখন বলে এ মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা হয় নি। ভেবেছে, এই কথা ব'লে মোচড় দিয়ে টাকা আদায় ক'রবে? শালা ছুঁচো—"

খুড়ো ক'নের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "ছি বাবাজী, এ কি কথা? এই মেয়েই তো আমি তোমার কথায় আশীর্ব্বাদ ক'রে গেছি। চৌধুরী ম'শায়ের তো আর মেয়ে নেই। এ সব কি ক'রছ?"

শ্রীবিলাসের মাথা একটু ঠাণ্ডা হ'তেই সে বুঝতে পারলে যে, দোষ তারই। লেকের ধারে প্রহেলিকাকে দেখেই সে বিয়ে করতে এসেছিল বটে, কিন্তু প্রহেলিকা যে কর্তার মেয়ে এটা সে স্থধু ধ'রেই নিয়েছিল, কোনও প্রমাণ না পেয়েই। তাই কর্তার মেয়েকে বিয়ে করবার প্রস্তাবই সে করেছিল, তাকেই বিয়ে করেওছে। সে যে প্রহেলিকা নয়, সেটা কর্তার বা তাঁর ছেলের দোষ নয়। সে চুপ মেরে গেল।—আসল কথা সে আর খুলে বল্‌লে না। তাই সবাই অবাক হ'য়ে ভাবতে লাগল এ কাণ্ডটা কেন ক'রলে সে!

তারপরে বাসরে তার লাঞ্ছনার আর অবধি রইলো না। কান ছুটো প্রায় ছিঁড়েই গেল। যারা স্থযোগ পেল তারা সে স্থযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার ক'রে কান টানলে পরিহাসের ভাণ ক'রে, কিন্তু প্রচণ্ড ক্রোধের সঙ্গে।

পরিশেষে শ্রীবিলাস আর একবার তার স্ত্রীর দিকে চেয়ে দেখে আশ্বস্ত হ'ল। সে নেহাৎ ঠকে নি। এখন মনে হ'ল বউটি দেখতে দিব্যি। কিন্তু তা হ'লে—সে কে?

* * * *

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় ২৫নং গোল্লাপাড়া লেনের বিবাহ আসরে ব'সে নিখিলেশ যখন সপ্তম স্বর্গে প্রবেশ করবার জন্যে পা বাড়াচ্ছে তখন সে ধপ ক'রে আছাড় খেয়ে প'ড়লো।

শুভদৃষ্টির সময় তার চোখের দৃষ্টিতে অশেষ প্রেম মাখিয়ে প্রহেলিকাকে সম্ভাষণ ক'রতে গিয়ে সে দেখলে—আর একজন!

ভয়ানক চমকে গেল সে, কিন্তু বুদ্ধিমানের মত চুপ মেরে গেল। সেই যে মুখ বুজলো, সে মুখ খুললো প্রায় শেষ রাত্রে, বাসরের হাঙ্গামা যখন মিটে গেল।

নববধূর দিকে চেয়ে সে দেখলে, প্রহেলিকা না হ'লেও সে সুন্দরী। সে জিজ্ঞেস করলে, "তোমার নাম কি?"

বধূ মাথা নীচু ক'রে বল্‌লে, "অশোকা।"

বেশ মিষ্টি গলা মেয়েটির।

"তুমি কি পড়?"

"থার্ড ইয়ারে পড়ি।"

তার হাতখানা নিখিলেশ হাতের ভিতর টেনে নিলে। ভারী নরম, ভারী মিষ্টি হাতখানা।

যা'ক সে ঠকেনি।

কিন্তু বড় লজ্জা পেয়েছে সে! সেই দুরন্ত মেয়েটা তাকে এমনি ক'রে ঠকিয়ে আচ্ছা নাকাল করেছে। যা হ'ক সে ঠকামির কথা এরা যখন কেউ জানে না তখন চেপে গেলেই হবে। কে আর লজ্জা দেবে তাকে?

বেশ খুসী হয়েই সে আলাপ সুরু করলে.

কথায় কথায় অশোকা বল্‌লে, সে নিখিলেশকে দেখেছে বিয়ের আগে।

"কবে? কোথায়?"

"কেন? সেই সেদিন, লেকের ধারে যখন প্রহেলিকা আপনার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করলে—আমি তো তখন সঙ্গেই ছিলাম।" ব'লে আশোকা হাসতে লাগলো।

'যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানে সন্ধ্যে হয়!' নিখিলেশ ভেবেছিল লজ্জার হাত থেকে সে রক্ষে পাবে, কিন্তু সে জন্য যার না জানাটা সবচেয়ে বেশী দরকার ছিল সেই সব জানে!

নিখিলেশ একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেল।

* * * *

বাঁড়ুজ্যে যখন বিয়ে ক'রতে গেল তখন সে খুব উৎফুল্ল মেজাজে ছিল না। বরং তার ভাবটা অনেকটা হাড়িকাঠে যাবার পথে পাঁঠার মত হয়েছিল। ইদানীং দু চার দিন প্রহেলিকার যে মেজাজ ও যে ঈর্ষার পরিচয় সে পেয়েছে তাতে তার মনে হ'চ্ছিল ঠিক সে যে কথা ইলাকে বলেছিল—এমন মেয়ের সঙ্গে ঘর করতে লেঠা আছে।

গোপনে বিয়ে হ'চ্ছে, তাই "পরিমেয় পুরঃসর" হ'য়ে মাত্র দু'চারটি বন্ধু নিয়ে সে গেল বিয়ে করতে। যে বাড়িতে বিয়ে সেখানে কিন্তু অতটা ঢাক ঢাক গুড় গুড় দেখলে না। দরিদ্র মধ্যবিত্ত ঘরে বিয়ের আয়োজন যেমন হ'য়ে থাকে তেমনি হয়েছে।

যতই গোধূলি ঘনিয়ে এলো ততই তার বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। কেবলি মনে হ'ল "কাজটা ভাল হচ্ছে না।"

যাক্, উপায় যেকালে নেই আর, সেখানে দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়া ছাড়া সে আর কি করবে।

বাঁড়ুজ্যে ভেবেছিল বিয়েটা হবে ব্রাহ্ম মতে। কিন্তু আয়োজন উজ্জুগ দেখলে সব হিন্দু বিবাহের। ভাবলে, কালে কালে কতই হবে।

বামুন কায়েতে বিয়ে হবে, কিন্তু অনুষ্ঠানে হিঁদুয়ানী বজায় থাকবে! হাসি পেলো তার।

সম্প্রদানের সময় সে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হ'য়ে ভাবছিল শুধু ইলার সেই কথা। ভাবছিল আজ রাত থেকেই তার নাকে দড়ি দিয়ে প্রহেলিকা কি টানাটানিটাই লাগাবে! সে কিছুই শুনতে পেলো না।

শুভদৃষ্টির সময় মুখ তুলে চাইতেই হয়, চেয়ে দেখে তার প্রাণে জল এলো!

বাপ! প্রহেলিকা নয়! ইলার সঙ্গে হ'ল তার বিয়ে!

তার পর তার চেহারা ফিরে গেল।

কথার ফোয়ারা ছুটলো তার।

বাসর ঘরে কেউ তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলো না। রসিকতার লড়াইয়ে সবাই পরাজয় স্বীকার করলো।

যখন সে অবসর পেলো তখন ইলাকে চট ক'রে বুকের ভিতর চেপে নিয়ে সে ব'ললে, "বাঁচালে আমায়—ওঃ! ইলা তুমি স্বর্গের দূত!"

২৪

সারারাত্রি জেগে প্রমোদের চোখ দুটো গিয়েছিল ফুলে। সারাদিন ঘুমিয়ে তার চেহারায় কিছু মাত্র উন্নতি হ'ল না।

ঘুম ভেঙে সে উঠলো কাঁদতে কাঁদতে। স্বপ্ন দেখছিল সে প্রহেলিকার—স্বপ্নেও তাকে হারিয়ে সে আকুল হ'য়ে কাঁদছিল।

যাত্রা ক'রে চললো সে বিয়ে ক'রতে, তার সমস্ত অন্তরটা কাণায় কাণায় ভরে' ছিল কান্নায়—যেন একটু নাড়া দিলেই সে কান্না গড়িয়ে প'ড়বে চোখের জলে।

মনের চারিদিকে খোঁচা দিচ্ছিল প্রহেলিকার সহস্র স্মৃতি। চোখের সামনে সর্বক্ষণ ভাসছিল প্রহেলিকার মায়া মূর্তি! তার চক্ষুকর্ণের সামনে থেকে নিঃশেষে বিলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল তার চার পাশের বাস্তব জগৎ—ছিল স্বধু প্রহেলিকা।"

থেকে থেকে তার মনে চাবুক মারছিল তার বিবেক। কে যেন তার কানে স্বধুই ব'লছিল "কাপুরুষ!"

সত্যি কাপুরুষ সে! কেন সে দুর্বলের মত স্বধু মাথা পেতে নিল তার এ দুর্গতি? কেন স্পষ্ট ক'রে সে সবাইকে ব'লতে পারলে না যে যোগেন বাবুর মেয়েকে বিয়ে ক'রতে তার যথার্থ আপত্তিটা কি?

বিয়ের আসরে—বরাসনে ব'সে সে দেখতেও পেলো না কিছু, শুনতেও পেলো না। শুনলে স্বধু প্রহেলিকার মধুর কণ্ঠ, দেখলে প্রহেলিকার সহস্র মূর্তি! পুতুলের মত ব'সে সে বিয়ে ক'রে গেল।

শুভদৃষ্টির সময় কে যেন ধাক্কা দিয়ে তাকে ব'ল্লে, "চেয়ে দেখ ভায়া!"

হুড় মুড় ক'রে চমকে উঠে সে সামনের দিকে চাইলে। আবার চমকে উঠলো। এ কি মায়া? তার বাইরের চোখ কি অন্ধ হ'য়ে গেছে? মনের ভিতরের যে ছবি তাই স্বধু দেখছে চর্ম চক্ষেও?

চোখ বিস্ফারিত ক'রে দেখলে সে—আশ্চর্য!

এমন আশ্চর্য মিল দুটো মুখে হ'তে পারে?

ভেবে তার স্বখ হ'ল না। বুকভাঙা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে স্বধু।

বাসরে কেউ কোনও উপদ্রব ক'রলে না। বরকনে'কে রেখে দোর ভেজিয়ে দিয়ে যে যার বেরিয়ে গেল অল্পক্ষণ বাদেই।

বউ শাড়ী মুড়ি দিয়ে শুয়ে প'ড়েছিল। প্রমোদ ব'সে ব'সে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলো। ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস প'ড়তে লাগলো,

নিঃশব্দে দুটো চোখ থেকে জলের ধারা তার গণ্ড বেয়ে ঝ'রে প'ড়তে লাগলো।

হঠাৎ সে লক্ষ্য ক'রলে যে কাপড়ে ঢাকা বধূর দেহখানি ভূমিকম্পের মত কাঁপছে।

দেখে সে ভয় পেয়ে গেল। ব্যস্ত হ'য়ে ব'ল্লে, "তোমার কি হ'য়েছে? অসুখ ক'রছে কি?"

কথা কয় না মেয়ে—সুধু কাঁপে। হিষ্টিরিয়া আছে নিশ্চয়! তা' নইলে যুদ্ধযাত্রীকে খামখা বিয়ে ক'রতে চায়?

গায় হাত দিয়ে নাড়া দিয়ে প্রমোদ ব'ল্লে, "কী হ'য়েছে?—"

এইবারে সে কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে একটা অমৃতের ফোয়ারা খুলে গেল, শোনা গেল খিল খিল হাসি।

কম্পিত হৃদয়ে অসম্ভব দুরাশা নিয়ে প্রমোদ খপ ক'রে বউয়ের মুখের কাপড় সরিয়ে দিলে।

—সেই মুখ—সেই চটুল চাহনী—সেই মন মাতান হাসি!

এক লাফে প্রমোদের অন্তর উঠে গেল নন্দনের রাজপথে। বউ আর কেউ নয়—প্রহেলিকা।

তার মুখখানা দুই হাতে চেপে ধ'রে প্রমোদ কিছুক্ষণ সুধু অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখলে—উল্লাসে চীৎকার ক'রে ব'ল্লে, "প্রহেলিকা! তুমি?"

তার পর চুম্বনের প্রস্রবণে সে ভাসিয়ে দিলে প্রহেলিকার হাসি।

* * * *

ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলি।

যোগেন বাবু বিধায়কের আত্মীয় এবং সম্পর্কে প্রহেলিকার খুড়ো। যখন প্রমোদকে নিয়ে ঝুলোঝুলি ক'রছে প্রহেলিকা তখন যোগেনের ছেলে এসে বিধায়ককে দিয়ে গেল তার মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র।

সে চিঠি প'ড়ে এবং যোগেনের ছেলের কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে যা শুনলেন তাতে বিধায়কের মাথায় আকাশ ভেঙে প'ড়লো।

প্রহেলিকা চিঠি দেখে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। তার পর সে বিধায়ককে নিয়ে গেল যোগেন বাবুর বাড়ী।

সেখানে গিয়ে দেখা গেল ভয়ানক কাণ্ড।

তাঁর ছেলে নিমন্ত্রণ ক'রতে বেরিয়ে যাবার পর যোগেন বাবু খবর পেয়েছিলেন যে প্রমোদ যুদ্ধে যাচ্ছে। এ খবরে বাড়ীতে কান্নাকাটি লেগে গেল।

যোগেন ছুটে গেলেন সুবোধের কাছে। সুবোধ তাকে আশ্বাস দিলেন বটে, কিন্তু যোগেনের মন কিছুতেই শান্ত হ'তে চাইল না।

বিধায়ক গিয়ে দেখলেন যোগেন গালে হাত দিয়ে ব'সে ভাবছেন।

সব কথা শুনে বিধায়ক ব'ল্লেন, "প্রমোদ যুদ্ধে যাবেই, তাকে ফেরান যাবে না। আমরা সারা সন্ধ্যে সবাই মিলে ঝুলোঝুলি ক'রে ফেরাতে পারিনি।"

হতাশ হ'য়ে যোগেন বাবু ব'ল্লেন, "তবে কি হবে ভাই ?"

"মেয়ের বিয়ে দিওনা ওখানে।"

"সে তো দেবই না, কিন্তু মেয়ের বিয়ের কি হবে ?"

"সে ভার আমার। আমার ভাইয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দাও।"

"বাঁচালে ভাই।" ব'লে যোগেন তাকে জড়িয়ে ধ'রলে।

"কিন্তু তোমায় এক কাজ ক'রতে হবে। প্রমোদ যদি যুদ্ধে যাবে ব'লে বিয়েতে বাধা দিতে আসে তবে তুমি তাকে ব'লবে, সেজন্য তোমার আপত্তি নেই।"

"তার পর ?"

বিধায়ক তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ উপদেশ দিয়ে গেলেন।

তাই পরের দিন সে বাড়ীতে দুই লগ্নে দুটো বিয়ে হ'ল। যোগেনের মেয়ের বিয়ে হ'ল বিধায়কের ভাইয়ের সঙ্গে, আর প্রহেলিকার বিয়ে হ'ল প্রমোদের সঙ্গে।

প্রহেলিকার বাবা সেইদিনই এসে পৌঁছেছিলেন পাটনা থেকে। ভাইঝির বিয়ের নেমন্তন্নে এসে তিনি মেয়ের বিয়ে দিয়ে গেলেন।

* * * *

প্রমোদের অত্যুগ্র প্রেমোচ্ছ্বাসের পর যখন প্রহেলিকা কথা বলবার অবসর পেলে তখন সে ব'ল্লে, "আপনি ও সব কি ব'লছেন? প্রহেলিকা কে?"

প্রমোদ তার গাল টিপে ব'ল্লে, "একটি অত্যন্ত শয়তান মেয়ে।"

"তবে তো আপনিও কম শয়তান নন। সেই শয়তানকে লিখেছেন এত বড় একখানা চিঠি!" ব'লে কাল রাত্রের লেখা চিঠিখানা সে বের ক'রে তার এক একটা কথা নিয়ে এমন নষ্টামি আরম্ভ ক'রলে কেবল নিরবচ্ছিন্ন চুম্বনধারা ভিন্ন তার মুখ বন্ধ করবার কোনও উপায়ই পেলো না প্রমোদ।

* * * *

পরের দিন সকালে বিধায়ক এসে ব'ললেন, "আরে ছি, ছি, প্রহেলিকা, অবশেষে তুমিও বিয়ে ক'রলে কি না একটা পুরুষকেই—এই কদাকার ছোট জাতকে? আমি যে তোমার জন্যে একটা ফুটফুটে' ক'নে খুঁজছিলাম।

প্রহেলিকা ব'ললে, "উপায় নাই বিদূষক ম'শায়, এই বিশ্রী জাতটা পৃথিবী ছেয়ে ফেলেছে।"

"আমিও তো সেই কথাই ব'লেছিলাম। বার বার চার বার। এ খেলায় হারতেই হবে।"

"একে বলেন হার? রং‍এর টেক্কা পেয়েও?"

"হাজার হোক পুরুষ তো?"

মনোজ্ঞভাবে ঘাড় নেড়ে প্রহেলিকা ব'ললে, "উঁহু! আমি সম্প্রতি আবিষ্কার ক'রেছি যে পুরুষ ও মেয়ে দুইয়ের চেয়ে বড় আর একটা জাত আছে—সে মানুষ। পুরুষের সঙ্গে খেলায় আমারই জিত, কিন্তু মানুষের কাছে হেরে গেলাম।"